



জ্ঞানের আলো

২২ চৈত্র ১৪২৪ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১৮ইং

পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা



“ইয়েহ্ হামারে বাগকা গোলে গোলাব হয়, হযরত ইউছুফ (আঃ) কা চেহরা ইছমে আয়া হয়।
উছকো আজিজ রাখো। মায়নে উছকা নাম গোলাম রহমান রাখা”

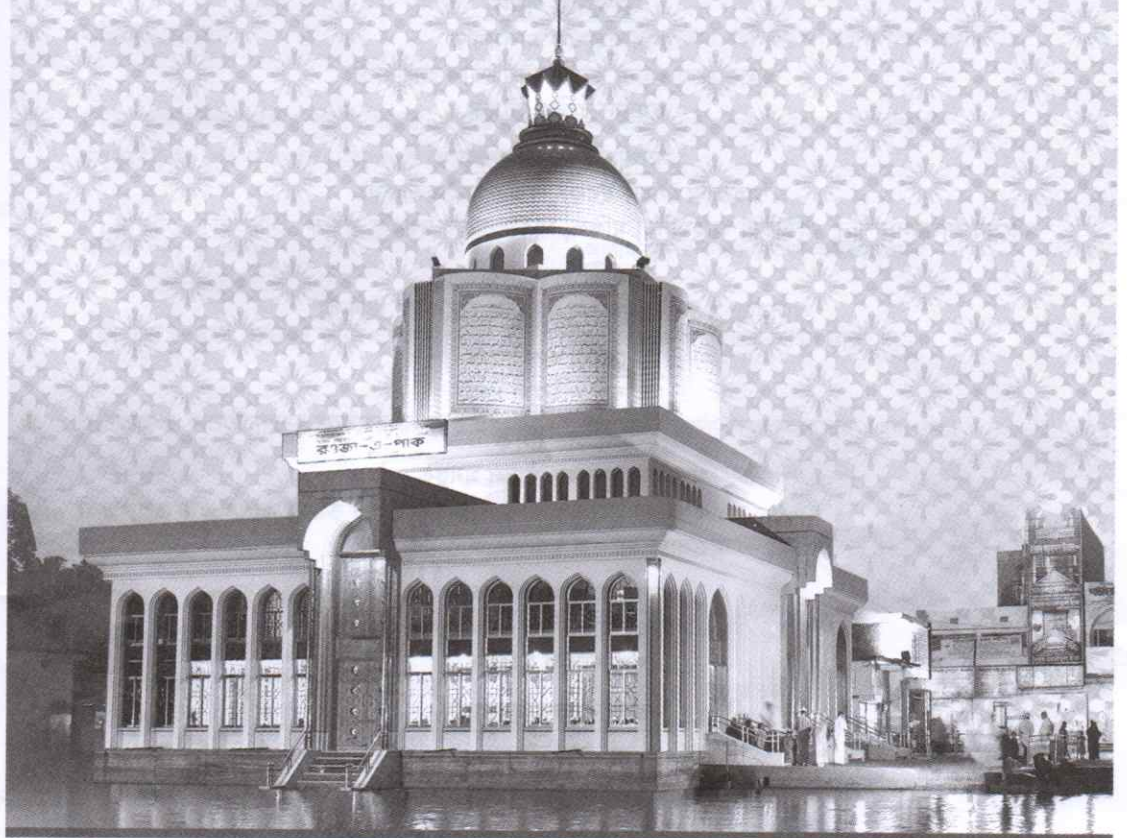
— গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা
শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)।



জ্ঞানের আলো

২২ চৈত্র ১৪২৪ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১৮ইং

পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা



“ইয়েহু হামারে বাগকা গোলে গোলাব হয়, হযরত ইউছুফ (আঃ) কা চেহরা ইছমে আয়া হয়।
উছকো আজিজ রাখো। মায়নে উছকা নাম গোলাম রহমান রাখা”

— গাউতুল আজম মাইজভাগুরী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা
শাহু ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)।



জ্ঞানের আলো

২২ টৈত্র ১৪২৪ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১৮ ইংরেজী
পবিত্র ওরশ শরীফ সংখ্যা

পৃষ্ঠপোষক

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্জ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

উপদেষ্টা পর্যদ

শেখ মুহাম্মদ আলমগীর
আলহাজ্জ মওলানা কাজী মঈনউদ্দীন আশরাফী
হুমায়ুন কবির চৌধুরী

সম্পাদক ও প্রকাশক

শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী
নায়েব সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

নির্বাহী সম্পাদক

আলহাজ্জ মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী

সহযোগী সম্পাদক

মুহাম্মদ নাজমুল হুদা

উপ-সম্পাদক

মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনছুর
মওলানা মুহাম্মদ আলী আসগর
মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবু মুছা

সহকারী সম্পাদক

মুহাম্মদ মহিউদ্দিন এনায়েত
শেখ শাকিল মাহমুদ

বিজ্ঞাপন তত্ত্বাবধায়ক

আবদুল মতিন

প্রচ্ছদ

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জ্ঞানের আলো ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কোন লেখার জন্য সম্পাদনা পর্যদ দায়ী নহে।

এতে শুধুমাত্র লেখকদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

মোবাইল : ০১৮১৬-০৩৫৫৯১, ০১৭১১৮১৭২৭৪

E-mail : shahemdadia@yahoo.com

Website : www.sufimaizbhandar.com

গুভেচ্ছা মূল্য : দশ টাকা মাত্র



সূচীপত্র

❖ সম্পাদকীয়		০৪
❖ কুরআনের আলো	আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী	০৫
❖ হাদিসের আলো	আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী	০৯
❖ গাউছুল আজম বিল বেরাহত কুতুবুল আক্কাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ও প্রাসঙ্গিকী	আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী	১১
❖ অসিলা কি? ও কেন?	আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান	১৬
❖ সুফী তত্ত্ব ও সুফী সাধনায় ফানা ও বাকা	অধ্যাপক ড. মওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ	১৮
❖ আউলিয়া-এ-কামেলীনগণের সুহবতের গুরুত্ব ও উপকারিতা	আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা (এম. এম.)	২৭
❖ বিশ্ব খ্যাত সুফি সাধক হযরত ওয়ায়েসুল করণীর (রঃ) ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন		৩১
❖ মালফুজাত : একটি পর্যালোচনা		
❖ হযরত কিবলা, হুজুর কিবলা বলা প্রসঙ্গে	সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুর রউফ	৩৫
❖ তাকুওয়ার গুরুত্ব	মুহাম্মদ মুরশেদুল হক	৪০
❖ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র আধ্যাত্মিক পরিচিতি		৫০
❖ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি-২০১৭		৫১
❖ সংগঠন সংবাদ		৫৪
❖ শোক সংবাদ		৬৩



সম্পাদকীয়

এশিয়া উপমহাদেশে চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার পূণ্য ভূমিতে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে খোদা প্রদত্ত ঐশী প্রেমের ভাণ্ডার মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ। সৃষ্টি জগতে পরম করুণাময় খোদাতা'লার অপূর্ব কৃপার নিদর্শন মহান “ফজিলতে রাব্বানী” হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবা এর প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মানতা বিশ্ব ইসলামকে বাস্তব আধ্যাত্মিক আলোকে নব জীবন দান করিয়া মানব জাতিকে সুপথগামী করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র নীতিমালা-তরিকা গ্রহণ করিয়া সহজ উপায়ে জিকিরের মাধ্যমে নফ্ছে আম্মারা হইতে কামেলা ও “উছুলে সাবআ”-সপ্ত পদ্ধতির মধ্যস্থতায়, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য স্মরণ ও আমল এই দুইটাকে খুব সহজ ও সুন্দরভাবে সমন্বয় করিয়া কথায়, কাজে ও আচরণে বিশ্ব মানবতার সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। যাহার ফলে তাঁহার অলৌকিকতা, ত্রাণ কর্তৃত্ব, যশঃকীর্তি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার সাহচর্যে ও খেদমত-ছোহবতের বরকতে বহু লায়েক, আলেম এবং খোদা প্রেম পেয়ারা জনগণ কামেল বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত হইল জজবায় খোদা প্রেম মত্ত অলি উল্লাহরূপে বাংলা, বার্মা, পাকিস্তান এবং সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িলেন। গাউছে পাকের ঐশী বেলায়তের করুণা ধারার মহিমায় ফয়েজ বরকত প্রাপ্তে কামালিয়তের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন- তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাহত, কুতুবুল আকতাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব। তাঁহার শরাফতের কারণে স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে ২২শে চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে যা প্রতি বছর হইয়া থাকে।

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম, হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর পরিভাষায়- “গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শ উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলে বিশ্ববাসীর চোখ চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের দিকে ঘুরিয়া যাইবে।” তাঁহার এই মহান প্রেরণাকে বাস্তবায়ন করার জন্য মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফত সুরক্ষায় তাঁহার মনোনীত সাজ্জাদানশীন, রুহী ওয়ারেছ, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃজিঃআঃ) ছাহেব তন্মধ্যে অন্যতম হইল “জ্ঞানের আলো” নামক ম্যাগাজিনের প্রকাশনায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ছিলছিল, শজরা, তরিকত, উসুল-নীতি, গাউছে পাকের শান, আজমত, জীবনী-কেরামত, আদর্শ বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসার করার সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)র শান আজমিয়তের প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ যাহারা এই সংখ্যায় লেখা পাঠাইয়াছেন তাহাদের সকলকে এই আন্তরিক চিন্তা ভাবনার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু স্থানাভাবে সকলের লেখা এই সংখ্যায় ছাপাইতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। আশা করি পরবর্তী সংখ্যায় গ্রহণযোগ্য লেখাগুলি ছাপানোর চেষ্টা করা হইবে। আর বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা প্রগাড় ভক্তি বিশ্বাস ও আন্তরিকতায় বিজ্ঞাপন দিয়া ও বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের প্রতি রহিল সবিনয় নিবেদন।

পরিশেষে এই প্রয়াসের কল্যাণে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ও হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) এর ফয়েজ বরকত যেন আমাদের সকলের নসীব হয় তাহার জন্য মওলার দরবারে আজিজি ও এল্তেজায় রহিলাম। “আমিন।”



কুরআনের আলো

আলহাজ্জ মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আব্দুল আলীম রিজভী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (آل عمران: ১০৩)

তরজমা : এবং (হে মুমিনগণ) তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো সবাই মিলে। আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং নিজেদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে শত্রু। অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। সুতরাং তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা জাহান্নামের একটি গর্তের প্রান্তে ছিলে। তখন তিনি তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারো। (১০৩নং আয়াত, সূরা আলে ইমরান)

আনুবাদিক আলোচনা : উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর বিশারদগণ বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আলাচ্য আয়াতের মাধ্যমে মুসলিম জাতির পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং কোন অবস্থায়ও অনৈক্য ও বিভেদের পথে অগ্রসর হতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। কেননা জাগতিক জীবনের সর্বস্তরে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি হলো ঐক্য ও সংহতি। আর অধঃপতনের মূল হলো অনৈক্য ও বিভেদ। পূর্ববর্তী ইহুদী ও নাছারা সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ও অধঃপতনের মূল কারণ ছিল- পারস্পরিক বিভেদ ও অনৈক্য। তাইতো আল্লাহপাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন, অর্থাৎ (হে মুমিনগণ!) তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও মতভেদ করতে শুরু করেছে।

ইহুদী ও খ্রীস্টান সম্প্রদায় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পরও শুধু কুসংস্কার ও কামনা বাসনার অনুসরণ করে ধৈর্যের মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহের মাধ্যমে আযাবে পতিত হয়েছে। তাই আল্লাহপাক ইহুদী নাছারাগণের অনুসরণে অনৈক্য ও কলহ বিবাদের ফাঁদে পতিত হওয়ার ব্যাপারে মুমিনগণকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

“আল্লাহর রজ্জু” বলে কি বুঝানো হয়েছে?

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পবিত্র বাণী “হাবলুল্লাহ” বা আল্লাহর রজ্জুর ব্যাখ্যায় তাফসীর বিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- প্রখ্যাত সাহাবীয়ে রসূল সাইয়্যিদনা হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রঃ), ইমাম কাতাদাহ (রহঃ) ও ইমাম ছুদী (রহঃ) এর মতে, “আল্লাহর রজ্জু” বলে পবিত্র কোরআনে করীমকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হাবীবে খোদা (সঃ) ইরশাদ করেছেন- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ .

পবিত্র কোরআন হলো মহান আল্লাহপাকের রজ্জু, যা আকাশ হতে জমিন পর্যন্ত প্রলম্বিত। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত যায়দ বিন আকরম (রঃ) এর রেওয়ায়েতেও ইরশাদ হয়েছে- كِتَابُ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ . অর্থাৎ আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে পবিত্র কোরনুল করীম, সহীহ মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে আল্লাহর রসূল (সঃ) ইরশাদ



করেছেন- **كتاب الله هو جبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة** .

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব হলো- আল্লাহপাকের কুদরতের রজ্জু, যারা এর অনুসরণ করবে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আর যারা অনুসরণ করবে না, তারা গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হবে। (মুসলিম শরীফ)

মহান সাহাবীয়ে রাসূল (স:) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রঃ) অপর বর্ণনায় বলেন, আল্লাহর রজ্জু দ্বারা “জামা’আত” তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতকে বুঝানো হয়েছে।

يدالله على الجماعة فمن شذ شذ في النار .

যেমন- হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে- যারা আল্লাহর রজ্জু হাত জামা’আতের উপর থাকবে। যে লোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আত হতে পৃথক হয়, সে যেন জাহান্নামে প্রবেশ করলো।

হযরত ইবনে মাসউদ (রঃ) আরো বলেছেন, তোমরা জামা’আত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকাকে অনিবার্য করে নাও। কেননা, সেটাই হচ্ছে “আল্লাহর রজ্জু” যাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান) **جبل الله هو القرآن** .

কোন কোন তাফসীরকারক বর্ণনা করেন, আল্লাহর রজ্জু বলে আল্লাহর দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর রজ্জু বলে আল্লাহর অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে।

পবিত্র কোরআন তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের মূল। ঐক্যের বিশেষ একটা কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা অত্যাৱশ্যক। এ বিষয়ে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে। কোথাও বংশগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। যেমন- আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কোরাইশ এক জাতি ও বনু তামীমকে অন্য জাতি মনে করা হতো। কোথাও বর্ণগত পার্থক্যই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের একজাতি ও শ্বেতাঙ্গদের অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। আবার কোথাও দেশগত ও ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়েছে। ফলে বাঙালিরা এক জাতি ও আরবীরা অন্য জাতি হয়ে গেছে। আবার কখনো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু নিয়ম-প্রথাকে ঐক্যের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। যারা এসকল নিয়ম প্রথা পালন করে না, তারা ভিন্ন জাতি। যেমন ভারতের হিন্দু ও আর্য সম্প্রদায়ের কথা বলা যায়।

পবিত্র কোরআনে করীমের উদ্ধৃত আয়াতে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে পরিহার করে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আল্লাহর রজ্জু তথা পবিত্র কোরআন ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতকে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং দৃষ্টকর্তে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা সবাই মিলে একজাতি। যারা এ রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাফিররা ভিন্ন জাতি। যারা এ রজ্জুর সাথে জড়িত নয়।

যদি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, প্রত্যেক মতভেদই কি নিন্দনীয় এবং মতভেদের কোন দিকই কি অনিন্দনীয় নেই? এর উত্তরে বলা হবে যে, প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়; বরং যে মতভেদে প্রবৃত্তির তাড়নায় কোরআনে করীম হতে দূরে সরে চিন্তা করা হয়- তাই নিন্দনীয়। কিন্তু যদি কোরআনের নির্ধারিত সীমার ভেতর থেকে রাসূল পাক (স:) এর ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও সেবার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, তবে সে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়, ইসলাম তা অস্বীকারও করে না। সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়ীন এবং ফিকুহ শাস্ত্রবিদ আলেমগণের মধ্যকার মতভেদ ছিল এমনি ধরণের, এমন মতভেদকে রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অবশ্য যদি এসব শাখা বিষয়কে দ্বীনের মূল সাব্যস্ত করা হয়, তাও নিন্দনীয়।

পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ জানাই, তিনি যেন সবাইকে আমল করে উভয় জগতে সফলকাম হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করেন। আমীন।।

অধ্যক্ষ : কাদেরীয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।



“মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমারই মদিরা পাত্র
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র।”

- খাদেমুল ফোক্রা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, দরজা-এ-অহীয়ে গাউছুল আজম,
রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা
শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
(মঃজিঃআঃ) ছাহেব কেবলার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং
নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব

সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক
মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব ঐর সম্পাদনায়
মহান ২২ চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত
“জ্ঞানের আলো”র সফলতা কামনায় নিবেদিত—



আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ঐর তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন)

চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ

৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।



আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগরী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদ

(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগরী (কঃ) ঐর
তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন)



মুহাম্মদ আজম খান
সভাপতি
০১৮১৭-৭১০৬১০



মুহাম্মদ শফিউল আলম ভূইয়া
সহ-সভাপতি
০১৭৩৪-৯৭১৯১৬



আহসানুল হক বাদল
সাধারণ সম্পাদক
০১৮৪১-৮১৭২৭৪



মুহাম্মদ ইউসুফ সওদাগর
কোষাধ্যক্ষ
০১৮১১-৮৩৩০০০



মওলানা মুহাম্মদ আলী আজগর
দারুল-তায়ালীমের সম্পাদক
০১৮৪৪-০৪৩০০৮



মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
সাংগঠনিক সম্পাদক
০১৮১৫-৬৮০২৪১



আই. এইচ. মুহাম্মদ মিয়া
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
০১৮১৭-৭৯৩৪৪৭



অধ্যাপক আহমদ কবির
দপ্তর সম্পাদক
০১৯৮৭-৫৪১৯৭০



মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম খান
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
০১৮১৮-০০৪৭৯১



শফিউর রহমান (সাইফু)
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
০১৭৭৫-৬৬২১৫৭



হাদিসের আলো

কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، أَوْ بَبْعُضِ جَسَدِي، فَقَالَ لِي : يَا عَبْدَ اللَّهِ ،
كُنْ فِي الدُّنْيَا لَكَ غَرِيبٌ ، أَوْ غَايِرَ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَقَالَ لِي عَبْدُ
اللَّهِ : يَا مُجَاهِدُ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ ، وَإِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ ،
وَاخْذْ مِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَمِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا .

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) বলেন- আমাকে আমার আব্বা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হাদিস বর্ণনা করেছেন- তিনি আবু মুয়াবিয়া, লাইছ ও মুজাহিদের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাপড় অথবা আমার শরীর ধরে ইরশাদ করেছেন- হে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর! দুনীয়াতে তুমি একজন মুসাফির বা পথচারী হিসেবে অবস্থান কর। আর নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য কর। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ ইবনে জবর মক্কী (রহ:) বলেন- আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) বলেছেন- হে মুজাহিদ! যখন তুমি সকালে উঠবে, তখন সন্ধ্যা নিয়ে চিন্তা করনা, আর যখন সন্ধ্যা হবে, তখন সকাল নিয়ে ভেবনা। মৃত্যু আসার আগে জীবনকে কাজে লাগাও, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থ অবস্থাকে কাজে ব্যবহার কর, কেননা হে আল্লাহর বান্দা! তুমি জাননা আগামীকাল তোমার কি নাম হয়।

(কিতাবুযযুহুদ-ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) পৃ: ২৩, প্রকাশনায়-দারুল হাদিস-কায়রো, মিশর)
আলোচ্য হাদিসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য হাদিস অনাড়ম্বর জীবন যাপনের এক মজবুত দলীল। কেননা, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ)কে একজন মুসাফির অথবা একজন পথচারী হিসেবে এ দুনীয়ায় অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। একজন মুসাফির বা পথচারীর নিকট খুবই সামান্য পরিমাণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়া আর বেশী কিছু থাকেনা। অন্যথায় তার পক্ষে পথ চলাই কঠিন হয়ে পড়বে। সহজভাবে চলতে গেলে বোঝা যতই হালকা হয়, ততই পথচলা সহজ হয়। এ দুনীয়ায়ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করতে গেলে তার পেছনে নিশ্চিত রূপে বেশী সময় ব্যয় করতে হবে। উপার্জনের পদ্ধতিতে অবৈধ উপায় এসে জড়াতে পারে। তবে বৈধ উপায়ে প্রচুর সম্পদ ভাল নিয়তে সঞ্চয় করাকে ইসলাম অবৈধ বলেনি। উভয় জগতের সাফল্য অর্জনে বৈধভাবে অর্জিত সম্পদও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। অনেক সম্পদ ঐ ব্যক্তির জন্য মুছিবত, যিনি যথাযথ ভাবে হিসেব করে যাকাত আদায় করেন না, বা সমাজের অসহায় মানুষের জন্য ব্যয় করেন না। ইসলামের বিশাল ক্ষেত্রে সবকিছুর নজীর বা দৃষ্টান্ত



বিদ্যমান। তবে প্রেক্ষিত ভিন্ন। যে ব্যক্তি বৈধ পন্থায় প্রচুর সম্পদ আহরণে সক্ষম নয়, তাকে অবৈধ পথে হলেও প্রাচুর্য অর্জন করতে হবে এমনটি নয়। কারণ, ঐ পথে সম্পদ অর্জন করতে গেলে নিশ্চিত ভাবে অন্যের হক ধ্বংস করতে হবে। ইসলাম এটাকে কোন ভাবেই সমর্থন করেনা। সুতরাং, সম্পদ আহরণ থেকে গুরু করে সব ক্ষেত্রে মুসলমানকে অবশ্যই আল্লাহ-রাসূল নির্দেশিত পথে চলতে হবে। অন্যথায় পরকালে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। বৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থ সম্পদের মালিকের অস্থিত্বও ইসলামের ইতিহাসে বিদ্যমান, যেমন ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান গনী (রঃ)। আবার সহায় সম্বলহীনের দৃষ্টান্তও বিদ্যমান। যেমন হযরত আবু যার গিফারী (রঃ)। আবার সাহাবা কেরামগণ বিশাল সম্পদের মালিক হলেও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।

অতঃপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তুমি নিজেকে কবর বাসীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য কর। কারণ, যিনি নিজেকে সেভাবে গণ্য করবেন তিনি কোন ভাবেই অবৈধ পথে পা বাড়াবেন না। ভোগ-বিলাসে আত্মহী হবেন না। সর্বদা মৃত্যু ভয় তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। তাই যিনি প্রতিদিন বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করবেন। তিনি শহীদের মর্যাদা লাভে ধন্য হবেন। যিনি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ভাববেন, তিনি কোন ভাবেই পরের হক ধ্বংস করার চিন্তাই করতে পারেন না। খোদা ভীতি না থাকলেই মানুষের পক্ষে পরের হক ধ্বংস করা সম্ভব। ইসলাম মানুষের অধিকারের বিষয়টিকে বেশ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে। অধিকার বঞ্চিত জনগণ দেয়ালে পিঠ ঠেকলে বসে থাকবে না। অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তৈরীতে আত্মনিয়োগ করবে নিঃসন্দেহে। এতে তাদের মূল্যবান জীবনও হুমকির মুখে পড়তে পারে। এজন্য তারাই দায়ী হবেন, যারা মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নেয়।

উপরোক্ত মর্মবাণীর আলোকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) তাঁর অনুগত শিষ্য হযরত মুজাহিদকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন- সকালে বিকালের চিন্তা, বিকালে সকালের চিন্তা কর না। তার মানে তুমি সর্বদা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে চল। তিনিই তোমার যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণের পথ সুগম করে দেবেন। বান্দার কাজ হল আল্লাহর প্রদত্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়ে কাজে লেগে থাকা। উন্নতি দান করা মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর ন্যস্ত। এভাবে যারা সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসায় নেমেছেন আল্লাহ তাঁদেরকে খ্যাতিমান শিল্পপতি বানিয়ে দিয়েছেন। তার প্রচুর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে বিদ্যমান। অতঃপর তাঁদেরকে খ্যাতিমান শিল্পপতি বানিয়ে দিয়েছেন। তার প্রচুর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে বিদ্যমান। অতঃপর সুস্থ অবস্থায় প্রয়োজনীয় সবকিছু করার লক্ষ্যে তৎপর থাকতে হবে। কারণ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে যে কেউ যেকোন সময় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তখন প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের সুযোগ থাকবেনা। তাই প্রথমতঃ সুস্থ থাকার ব্যাপারে সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে এবং সুস্থ থাকা অবস্থায় ভবিষ্যতের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। যে কোন সময় মৃত্যু এসে উপস্থিত হতে পারে। তাই তার আগে জীবন থাকতে তাকে মূল্য দিতে হবে। কারণ, জীবন কোথাও কিনে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমা ঠিক করা আছে অজানা অবস্থায়। সুতরাং জীবনের একটি মূহুর্তও অবহেলায় কাটানোর কোন সুযোগ নেই। সময় বিশেষ করে যৌবনকাল অমূল্য সম্পদ। তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। অন্যথায় আফসোস করা ছাড়া কোন উপায় অবশিষ্ট থাকবে না। হযরত আলী (রঃ) বলেছেন- যৌবনকাল যদি কোথাও বিক্রি হয় এমন পন্য হত, তাহলে বিক্রেতার চাহিদানুসারে মূল্য দিয়ে খরিদ করতাম। কিন্তু, এ জগতে এমন কোন বাজার নেই, যেখানে যৌবনকাল বিক্রি হয়, যা বয়স্ক লোকজন খরিদ করে উপভোগ করতে পারবে। প্রত্যেক মানুষ তার জীবনকে সঠিক পথে কাজে লাগাতে পারলে, অবশ্যই সাফল্যতার মকুট চূষন করবে।

শায়খুল হাদিস : ছোবহানিয়া আলীয়া কামিল (এম, এ) মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।



গাউছুল আজম বিল বেরাছত কুতুবুল আক্ताব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাগুরী (কঃ) ও প্রাসঙ্গিকী

আলহাজ্ব মওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী

মাইজভাগুর দরবার শরীফের পরিচিতি এখন আর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে বহিঃবিশ্বেও পাড়ি জমিয়েছে নিঃসন্দেহে। এই দরবার শরীফের শরাফতের স্থপতি, প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ, মাইজভাগুর শরীফের মধ্যমণি, অলীকুল সম্রাট, গাউছিয়াত নীতি সপ্ত পদ্ধতির রূপকার, মাইজভাগুরী তরীকার প্রবর্তক, গাউছুল আজমীয়ত এর তাজধারী, প্রিয় নবী করিম (সঃ) এর পবিত্র বংশধর, হযরত আকদস ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর আধ্যাত্মিক বাগানের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট ফুল হলেন হযরত বাবা ভাগুরী কেবলা (কঃ)। যার পূর্ণ নাম হলো হযরত মওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাগুরী (কঃ)। “বাবা ভাগুরী” নামে যিনি সমগ্র বাংলাদেশ ও দেশের বাইরে সমধিক পরিচিত। হযরত বাবা ভাগুরী কেবলা (কঃ) গাউছুল আজম মাইজভাগুরী কেবলা (কঃ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা।

তিনি এমন এক মহান অলিয়ে কামেল ছিলেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। যার অবস্থান ভূ-পৃষ্ঠে হলেও তাঁর পদচারণা ছিল রুহী জগতে। যিনি ছিলেন পৃথিবীর বিখ্যাত সাধক, আধ্যাত্মিক জগতে যার বিচরণ ছিল উভয় জগতব্যাপী। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর প্রধান খলীফা, যার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বব্যাপী, সে মহান সত্তার করুণা প্রত্যাশায় যথাক্রমে জীবনী আলোকপাত করার প্রয়াসে এ উপস্থাপনা: নতুবা তাঁর পূর্ণ জীবন আলোচনা এক অকুল সমুদ্রতুল্য।

আওলাদে রুছুল (সঃ), খলীফায়ে গাউছুল আজম, ইউসুফে সানী, জামালে মুস্তফা (সঃ), হাজত রওয়া, মশকিল কোশা, গাউছে ছমদানী, কুতুবে রব্বানী, শায়খে ফায়াল, মুজাদ্দিদে আখের জমান, হযরত মওলানা শাহ্ সুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাগুরী (কঃ) প্রকাশ বাবা ভাগুরী বা বাবাজান কেবলা (কঃ) ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী, ১২৮৪ হিজরী সনের ১২ই জমাদিউসসানী, রোজ সোমবার ভোর বেলা মাইজভাগুর শরীফে শুভ জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আবদুল করিম শাহ (রঃ) ছিলেন হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী সৈয়দ আহমদ উল্লাহর (কঃ) সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর মাতার নাম ছিলেন সৈয়দা মোশাররাফ জান বেগম। বাবা ভাগুরীর জন্মের পূর্বে একদা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী বাবাজান কেবলার আম্মাজানকে দেখে “পীরানে পীর সাহেবের মা” বলে সম্বোধন করেছিলেন। পরবর্তীতে সে ভবিষ্যদ্বানীর বাস্তবতা হলো বাবাজান কেবলার জন্ম লাভ। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ নবজাত শিশুকে দেখে আত্মহারা হয়ে বলতে লাগল “এ শিশু মানব নয় বরং এক সম্মানিত ফেরেস্টা, আমরা এরূপ সুন্দর ছেলে কখনো দেখি নাই, নিশ্চয়ই ইনি কালক্রমে একজন উচ্চ মর্যাদার অলী হবেন।” জন্মের ৭ম দিবসে শিশু বাবা ভাগুরীকে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) এর খেদমতে নেয়া হলে তিনি হস্ত প্রসারিত করে তাঁকে কোলে তুলে নেন এবং উর্দু ভাষায় বলতে আরম্ভ করেন যার বাংলা অর্থ হলো “এ শিশু আমার বাগানের গোলাপ ফুল, হযরত ইউছুপ (আঃ) এর রূপলাবণ্য তাঁর মধ্যে এসেছে, তাকে যত্ন করো, আমি তার নাম গোলাম রহমান রাখলাম।” ঐ দিনেই তাঁর আকীকা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে হযরত গাউছুল আজম তাঁকে অত্যন্ত আদর স্নেহ করতেন, কোলে তুলে নিতেন, সান্নিধ্য দিতেন, নানা প্রকার ফল ও মিষ্টান্ন খাওয়াতেন। শৈশবকালে তিনি অসাধারণ স্বভাব সম্পন্ন ছিলেন, বিছানা বা দোলনায় তিনি কখনো মল-মূত্র ত্যাগ করেন নাই। অন্যান্য সন্তান সন্ততির ন্যায় তিনি কান্নাকাটি করে মাকে বিরক্ত করেন নাই। অদৃশ্য হতে কেউ তাঁর দোলনা দুলিয়ে



তাকে ঘুম পাড়াতে দেখেছিলেন তাঁর আত্মজান। এতে তাঁর প্রতি স্নেহভর মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়।

তাঁর বয়স যখন ২ বৎসর ৬ মাস তখন থেকে তাঁর মাতা-পিতা তাঁকে পাঠাভ্যাসের মনস্থ করেন। অতঃপর একদা জুমার দিন তাঁর পিতা তাঁকে প্রথম পাঠ দেয়ার জন্য হযরত গাউছুল আযমের (কঃ) দরবারে নিয়ে আসেন। হযরত আক্দ্দাস শিশু সন্তানটিকে শিক্ষার্থীর বেশে দেখে মৃদু হাসলেন এবং বল্লেন: “তুমি কালামুল্লাহ পড়বে? আচ্ছা পড়ো দেখি” এ বলে তাঁকে কোরান শরীফের কিছু অংশ পড়িয়ে দিলেন। বাড়িস্থ ফোরকানীয়া মাদ্রাসায় পাঠাভ্যাস অপেক্ষা হযরত গাউছুল আজমের (কঃ) দরবারে যাওয়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ অধিকতর প্রকাশ পেত এবং অন্যত্র হতে অধিক সময় তিনি হযরত কেবলার দরবারেই অতিবাহিত করতেন।

নয় বৎসর বয়সে বাবাজান কেবলার পবিত্র খতনার কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। আর ভবিষ্যৎ মহত্বের সম্ভাবনা তাঁর শৈশবেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। সংযম, সাধনা, অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ বর্জন, হযরত কেবলার খেদমতে কিংবা নির্জনে অবস্থান, নিয়মিত নামাজ-রোজা-তাহাজ্জুদ পালন, তেলাওয়াতে কোরান মজিদ প্রভৃতি যাবতীয় শরীয়তের বিধানাবলী পালনে বিশেষ তৎপর হওয়া সহ সকল সদগুণাবলী কিশোর বয়স থেকেই তাঁর নিকট বিদ্যমান ছিল। এ সময় হতে তাঁর অসাধারণ রূহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পিতার আদেশে গৃহস্থলির কাজের মধ্যে তাঁকে মাঠে গরুর পাল নিয়ে দেখা-শুনা করতে হতো। শস্য ভরা ক্ষেতের আলের উপর গরুর পাল ছেড়ে দিয়ে তাদের বলতেন “দেখ শস্য নষ্ট করিস না।” এতে গরু আলের উপরের ঘাস খেয়ে উদর পূর্ণ করত কিন্তু চতুর্দিকের শস্য পূর্ণ ক্ষেতের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করত না। আবার যখন মাঠ শস্যশূন্য হতো তখন তিনি গরু পাল মাঠে ছাড়িয়ে বৃক্ষছায়ায় বসে একাত্মচিন্তে প্রভুর ধ্যান তন্ময় হয়ে থাকতেন। আর এদিকে গরুগুলো ইচ্ছেমত ঘাস খেয়ে কারো কোনরূপ ক্ষতি না করে সোজা বাড়ী ফিরে যেত। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর বাল্যাবস্থায় তাঁর রূহানী শক্তির প্রভাবে ভাষাহীন চতুঃষ্পদ পশুরাও নির্দেশ অলংঘিত ভাবে মেনে চলত।

পনের বৎসর বয়সে তিনি চট্টগ্রাম শহরস্থ সরকারী মোহসেনীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করতে যান। ক্রমান্বয়ে দু’বছর যাবৎ তথায় লেখাপড়া করেন। সমসাময়িককালে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ)র বিশিষ্ট খলীফা হযরত মওলানা আমিনুল্লাহ (রঃ) ফটিকছড়ি থানার প্রাণকেন্দ্র বিবিরহাটে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত বাবা ভাগুরী কেবলা (কঃ) সরকারী মাদ্রাসা ত্যাগ করে ফটিকছড়ি মাদ্রাসায় এসে ভর্তি হন এবং তথায় তিন বৎসর কাল শিক্ষা গ্রহণ করে পুণরায় পূর্বোক্ত সরকারী সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তাঁর শিক্ষক মণ্ডলী ও সহপাঠীগণ এক বাক্যে স্বীকার করতেন যে, তিনি স্বল্পভাষী, সদালাপি, বিনয়ী, স্বল্পাহারি ও নির্বীলাস ছিলেন। তাঁর ন্যায় ধর্মভীরু, আদর্শ চরিত্রবান ছাত্র মাদ্রাসায় দ্বিতীয়টি আর ছিল না।

তাঁর বয়স তেইশ বছর অতিক্রান্ত হলো, কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি দেখা গেল না, তাই তার মাতা-পিতা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করার আয়োজন করা হলো এবং ১৩০৭ হিজরী সনের ২৭শে ফালগুণ ফটিকছড়ি থানাধীন সুয়াবিল নিবাসী সৈয়দ কমর চাঁদ সাহেবের বংশধর, বাবা ভাগুরীর মামা সৈয়দ আশরাফ আলী সাহেবের প্রথমা কন্যা সৈয়দা জেবুন্নেছা বেগমের সাথে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। বিয়ের পরও দেখা গেল দিবা-রাত্রি তিনি হযরত আক্দ্দাছের সান্নিধ্যে কাটাতেই পছন্দ করতেন।

তাঁর বয়স যখন পঁচিশ বছর তখন তিনি জমাতে উলা (বর্তমান ফাজিল) শ্রেণীর পরীক্ষার্থী। মাইজভাগুর দরবার শরীফ থেকে তাঁর অধ্যয়নকৃত প্রতিষ্ঠান সরকারী মোহসেনিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার অনুমতি নিতে তিনি হযরত গাউছুল আজমের খেদমতে উপস্থিত হলে হযরত আক্দ্দাছ শহরে পরীক্ষায় যেতে অনুমতি দিলেন। শহরে গিয়ে মাদ্রাসায় পৌঁছে তিনি রীতিমত দুটি পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার তৃতীয় দিবসে পরীক্ষা কক্ষে উপস্থিত হলেন বটে কিন্তু তাঁর নিরাসক্ত উদাসভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাকে অসুস্থ মনে করে কর্তৃপক্ষ সেবা



শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেও বিফল হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর ভাবান্তর ঘটল। তিনি পরীক্ষা কক্ষে কাগজ কলম দূরে নিক্ষেপ করে “জজ্বা হালে” অনেক দুর্বোধ্য কথা বলতে লাগলেন এবং গজল পড়তে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি “আসিয়াছেন আপনি, আসিয়াছেন আপনি, কষ্ট স্বীকার করিয়া কেন আসিলেন, আমি মাথায় হাটিয়া আপনার খেদমতে হাজির হইতাম।” এ কথা বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এখানেই তাঁর মাদ্রাসা পরীক্ষা পর্বের ইতি হলো। কোন মতে তাঁকে বাড়ি পাঠানো হলে হযরত কেবলা (কঃ) নিজ হাত মুবারকে এক গ্লাস সরবত পান করালেন—ফলে তাঁর প্রেম নেশা কমতে থাকে এবং তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। এরপর কেউ তাঁকে আবার লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করার কথা বললে তিনি বলতেন— “হে মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রগণ, তোমরা যা কিছু অর্জন করছ তা সবই তোমাদেরকে ধাঁধায় ফেলেছে। শত কিতাব ও পত্রাবলী আঙুনে নিক্ষেপ কর এবং প্রিয়তমের প্রিয় অঙ্গনেই নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ কর।” এ ভাবেই তিনি আল্লাহর রহস্যমণ্ডিত আধ্যাত্মিক মহা সমুদ্রের অতল গভীরে প্রেম রাজ্যের সন্ধানে যাত্রা করেন।

একদা তিনি এক ওয়াজ মাহফিলে নামাজে ইমামতি কালে সুললিত কণ্ঠে কোরান শরীফ তেলাওয়াত করে মোক্তাদীগণকে আত্মহারা ও প্রেম বিভোর করে দিলেন। নামাজে এক অভূতপূর্ব তন্ময়তা ও ধ্যান মগ্নতার সৃষ্টি করলেন। প্রায় তিন ঘন্টা ব্যাপী নামাজে রত ছিলেন—অথচ মনে হলো যেন স্বল্প সময়ে নামাজ সমাপ্ত হলো। ওয়ায আরম্ভ হলে শোতামণ্ডলী তাঁর মধুর উপদেশ বাণী শ্রবণে যাদুবৎ তন্ময় হয়ে পড়ল, হৃদয় স্পন্দিত ও চক্ষু বিগলিত হয়ে গেল। এটা ছিল তার শেষ মাহফিল।

আঠাশ বছর বয়সে কঠোর আত্মিক ও দৈহিক সাধনার মাধ্যমে “নফ্ছে আম্মারা” বা কু-প্রবৃত্তি রিপু দমন করে আত্মার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারেফাতের বিকাশ সাধন করে হযরত বাবা ভাঞ্জরী কেবলা (কঃ) আধ্যাত্মিক জগতের চরম সোপানে উপনীত হন। পরবর্তী পার্থিব জীবদ্দশায় তিনি অসংখ্য কারামাত, অলৌকিক ঘটনাবলী প্রদর্শন করেন। গভীর অরণ্যে পাহাড়ে-পর্বতে তিনি প্রায়শঃ মহাপ্রভুর ধ্যান মগ্ন থাকতেন। গাছ-তরুলতা, জ্বীন-দৈত্য, এমনকি বন্য হিংস্র পশু পর্যন্ত তাঁকে বিনয় চিত্তে অভিবাদন করত। গভীর রাত অবধি ভয়ংকর বন-জঙ্গলে নির্ভয়ে তিনি সাধনায় রত থাকতেন।

তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তাঁর মহান মুরশিদ, পিতৃব্য হযরত গাউছুল আজম মাইজভাঞ্জরী কেবলা (কঃ) ইহধাম ত্যাগ করেন। তখন থেকে হযরত বাবা ভাঞ্জরী কেবলা (কঃ) দরবার শরীফে নিজ গৃহ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করা আরম্ভ করেন। তখন থেকে দেশের ও দেশের বাইরে তাঁর অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত নর-নারী আপন আপন বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে তাঁর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হতে থাকে। তিনি সাধারণতঃ কোন কথা বলতেন না। কচিৎ যা বলতেন তাও খুব সংক্ষিপ্ত, রূপক ও বহু অর্থবোধক ছিল এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রত্যেকে নিজ নিজ সমস্যার সমাধান তার মুখ নিঃসৃত বাণীর মধ্যে খুঁজে পেতে সক্ষম হতো।

স্মর্তব্য যে, প্রকৃতপক্ষে কম কথা বলা অথবা নিশ্চুপ থাকাটা ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি মহান চারিত্রিক গুণ বলে বিবেচিত। পবিত্র কোরান মজিদে আল্লাহ পাক যারা আবদুর রহমান কিংবা গোলাম রহমান (রহমানের বান্দাদের) তাদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : যারা রহমানের বান্দা গোলাম তাদেরকে যখন মুখ (জ্ঞানহীন পাপিষ্ঠ)রা সম্বোধন করে (মন্দ ব্যবহার করে) তখন তারা বলে থাকে “ছালাম” বা শান্তি। বিবাদ থেকে বাঁচতে নিরন্তর থাকাটাই শ্রেয়। কেননা কথা বলার মূসল ব্যবহারিক প্রত্যঙ্গ হলো জিহ্বা। এ জিহ্বার ভয়াবহতা বড়ই বিপদজনক। অর্থাৎ কথার মাধ্যমে মানুষ দুঃখে নিপতিত হয়। কটু কিংবা মিষ্ট কথাই হোক না কেন মুখ খুললেই বিপদ। এ বিপদ এড়াতে নীরবতা/নিশ্চুপতার বিকল্প নেই। নীরবতাকে হাদীছ শরীফে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন : “মান ছাকাতা ছালামা ওআ মান ছালামা ফাকাদ নাজা”— অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নীরবতা পালন করল সে শান্তিতে থাকল, আর যে শান্তিতে থাকল সে মুক্তি পেল।” অপর হাদীসে আছে : “মান ছামাতা নাজা” “যে নীরব



থাকল সে মুক্তি প্রাপ্ত হলো।" শান্তিতে থাকা ও মুক্তি পাওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় হলো নীরবতা। মাইজভাণ্ডারী তরীকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নীরবতা পালন করা। আর এই মহান গুণ নীরবতাই ভূষণ ছিল মহাত্মা হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) কেবলার। অহেতুক কথাবার্তা, অনর্থক বিতর্ক বর্জন করে নিশ্চুপতা ধারণ করা মাইজভাণ্ডারী গাউছিয়ত নীতির অন্যতম নীতি। এ প্রসঙ্গে হযরত অছী এ গাউছুল আজম, সাজ্জাদানশীন দরবারে গাউছুল আজম শাহ সুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) যিনি হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলার জামাতা ছিলেন তিনি ছন্দাকারে যে মটো রচনা করেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য—

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে জান তিন ভাবে
বাক-বিতণ্ডা পরিহারে
জানার আশ্রয়ে,
পর দোষ পরিহারে নিজ দোষ ধ্যানে।
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে
না দেখাইবে “পীর” যাকে
এই তিন ধারা
আসিবেনা সোজা পথে সেই পথ হারা ॥

হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) কেবলার নীরবতা অবলম্বন, জিহ্বাকে সংযত রাখা বড়ই কঠোর সাধনা, আর এ সাধনা শুধু নিজের মুক্তি নয় অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত পাপী-তাপীকে মুক্ত করার সাধনা। হযরত বাবা ভাণ্ডারীর এ উত্তম আদর্শ পরিলক্ষিত হয়েছিল তাঁরই দৌহিত্র শাহান শাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলার (কঃ) পুত্র স্বভাব-চরিত্রে। শাহান শাহ বাবা জানের আব্বাজান অছী-এ গাউছুল আজম, সাজ্জাদানশীন-এ গাউছুল আজম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর ন্যায় স্বল্পালাপে তরীকত ছিলছিলাকে নিষ্কলুষ পুত্র পবিত্র ও ভেজালমুক্ত রাখতে বর্তমান সাজ্জাদানশীন-এ-দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত আলহাজ্ব শাহ সুফী মওলানা সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা (মঃ জিঃ আঃ) স্বীয় স্বভাব চরিত্রে স্বল্পালাপ, বিনয় ও সদালাপকে আপন করে নিয়েছেন। কেননা তিনি অধুনা মাইজভাণ্ডার শরীফের শরাফত সুরক্ষায় নিবেদিত বর্তমান প্রাণপুরুষ এবং আধ্যাত্মিক মহাসাধক, মাইজভাণ্ডারী তরীকত ছিলছিলার মহান পথ প্রদর্শক, হযরত গাউছুল আজমের স্থলাভিষিক্ত অছী-এ-গাউছুল আজমের শীর্ষ প্রতিনিধি ও তৎকর্তৃক মনোনীত একমাত্র সাজ্জাদানশীন, মুরশিদে বরহক। কেননা তাঁরই তরীকত শিকলে আবদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো স্বয়ং গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ও হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) কেবলার করুণা সমুদ্রে অবগাহন করা। অতি স্বাভাবিক কারণেই সাজ্জাদানশীন হুজুর সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা (মঃ জিঃ আঃ) এর মধ্যে হযরত বাবা ভাণ্ডারী তথা অছী-এ গাউছুল আজম এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত, তাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃত গাউছিয়ত নীতি তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (কঃ) এর কৃপা জলধারা আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রচণ্ড শীত মওসুমে কনকনে শীতের মধ্যেও তাঁর পবিত্র হাতের উপর একাধারে পানি ঢালা হতো! কখনো ডান আবার কখনো বাম হাতের উপর। তাঁর এ পানি ঢালা ছিল এক অনিবর্তনীয় মহিমামণ্ডিত। এ যেন মহা প্রভুর এক কৃপা বারীধারা। তাঁর হস্ত বিধৌত এ জলপান করে সর্বসাধারণের দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম হতো। বিষয়টি সর্বসাধারণের জন্য ছিলো মুক্তির উপায়। যেমনটি আল্লাহপাক হযরত মুছা (আঃ) এর লাঠির আঘাতে প্রস্তর থেকে কয়েকটি জল ধারা নির্গত করেছেন, যেমনটি প্রিয় নবী করিম (সঃ) এর পবিত্র হস্তাংগুল থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়েছিল যাতে তৃষ্ণার্থ সাহাবাদের তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছিল। এভাবে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর নিকট থেকেও কল্যাণ লাভ করে বিশ্ববাসী ধন্য হলো, এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ।



হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (কঃ) সুদীর্ঘ একাত্তর বছর ছয় মাস কাল এ নশ্বর পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক লীলা সমাপন ও মানব কল্যাণ করে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল, ১৩৫৬ হিজরী সনের ২২শে মুহাররাম, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২২শে চৈত্র ভোর ৭-৫৫ মিনিটের সময় পরম প্রিয়তম মাহবুবে হাকিকী মহান আল্লাহর সাথে শুভ মিলনার্থে বিশ্ববাসীকে শোকে ভাসিয়ে পবিত্র অমর ধামে শুভ পদার্পণ করেন। প্রতি সন ২২শে চৈত্র তাঁর পবিত্র ওরছ শরীফ ও ২৭শে আশ্বিন (বর্তমান ২৯শে আশ্বিন) তাঁর শুভ জন্ম দিবস খোশরোজ শরীফ মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাঁর ফজিলত, ফয়জাত, কারামাত, বারাকাত ও কৃপা যেন আমাদের নসীব হয়; মহা মুনীবের পাক দরবারে এই প্রত্যাশা, এই ফরিয়াদ।

সাবেক মুহাদ্দিস : আহছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, কুলগাঁও, চট্টগ্রাম।

“ত্রি জগতে নাহি ভয় যথা তথা পাবি জয়।
যার হৃদে প্রবেশিছে প্রেম শাহা মাইজভাণ্ডার।।”
২২ চৈত্র পবিত্র ওরছ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত
‘জ্ঞানের আলো’র সফলতা কামনা করছি।
মুর্শিদে বরহক আলহাজ্ব হযরত মওলানা
শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক
মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এর মেহেরবানী প্রত্যাশায়

মনসুর আলম চৌধুরী

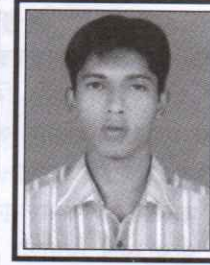
আশরাফ আলী চৌধুরী হাট (প্রকাশ সোমবাইজ্যা হাট)
গ্রাম + পোষ্ট : মধ্যম কদলপুর।
সহ-সভাপতি

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে
গাউছে মাইজভাণ্ডারী
(শাহ্ এমদাদীয়া)

কদলপুর শাখা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ৩য় মঙ্গলবার
মিলাদ ও জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

“নবীজীর নায়েব তিনি অলিকুলের শিরোমণি।
গাউছে ধনের বেলায়ত জমিন আহমান।।”

মেসার্স তামান্না ষ্টোর



প্রোঃ মুহাম্মদ আরমান
০১৮২৪-৩০৭২৪৪
মুহাম্মদ সোলাইমান
(কোম্পানী)
০১৮১৭-২০৫০২২

এখানে উন্নতমানের আইসক্রিম
ঠাণ্ডা কেমল পানীয় ও বাজেমাল
পাইকারী এবং হার্ডওয়ার্ডের
মাল পাওয়া যায়।

নতুন রঘুনন্দন চৌধুরীহাট, রাউজান, চট্টগ্রাম।



অসিলা কি? ও কেন?

আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছির রহমান

আসলে অসিলা আরবী শব্দ। অভিধানিক অর্থ মাধ্যম বা মারফত। কোরান হাদিস তথা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে অসিলা বলা হয় বিশ্ব সৃষ্টা পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্য অর্জনের জন্য অথবা ইহকাল-পরকালে বিভিন্ন বলা মুছিবত থেকে মুক্তি ও গুনাহ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য নবী-অলী-বিশেষত: ছরকারে দু'আলম হুজুর পূর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে খোদার দরবারে আর্জি ও ফরিয়াদ পৌছানো।

অসিলা সম্পর্কে পবিত্র কালামে পাক কোরান মজিদে ও হাদিসে নববীতে অনেক বর্ণনা বিদ্যমান আছে। নিম্নে কয়েকটি উদ্ভূতি পেশ করা হল। আশা করি পাঠক সমাজ গভীর ভাবে পর্যালোচনা করবেন।

স্বয়ং রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন— ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর সান্নিধ্য অর্জনের জন্য অছিলা বা মাধ্যম তালাশ কর এবং তাঁর রাস্তায় জেহাদ কর। তবে তোমরা সফলকাম হবে।

(আল কোরান-সূরা মায়েদা আয়াত-৩৫)

উক্ত আয়াতে করিমায় ঈমানদারগণকে লক্ষ্য করে আল্লাহকে ভয় করা তথা তাঁর হুকুম আহকাম ইত্যাদি মেনে চলার এবং জেহাদ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাথে সাথে অসিলা তালাশ করার হুকুমও করা হয়েছে। সুতরাং অছিলা দ্বারা কালাম পাকে কি বুঝানো হয়েছে? ঈমান না ইবাদত-বন্দেগী না জিহাদ। যেহেতু এ সবগুলি উক্ত আয়াতে পাকে ব্যক্ত আছে ফলে অধিকাংশ মুফাচ্ছেরীনে কোরান উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, অসিলা দ্বারা নবী-অলী বিশেষত: ছরকারে আখিয়া রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আসলে প্রিয় নবীর আবির্ভাবের পূর্বেও ইয়াহুদী-নাছারা তথা পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা দুঃখ-দুর্দশার শিকার হলে মুক্তির জন্য অথবা যুদ্ধ বিদ্রোহে জয়লাভ করার মানসে শেষ জমানার নবীকুল সম্রাট ছরদারে দু'জাহানের (স:) নাম মোবারকের অসিলা বা মাধ্যম ধরে বিশ্ব বিধাতা খোদা তায়ালা দরবারে ফরিয়াদ পেশ করতেন এবং তাদের ফরিয়াদ মঞ্জুর হত, যেহেতু তারা তাদের উপর নাজেলকৃত আসমানী কিতাব বা হুফিফা সমূহে শেষ জমানায় আগমনকারী নবীর শান-মান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। (তাফহিরে রুহুল বয়ান ও খাজায়েনুল এরফান ইত্যাদি)

ইমাম হাকেম হযরত ফারুকে আজম ওমর (রা:) থেকে বর্ণনা করেন— আদি পিতা হযরত আদম (আ:) জান্নাত থেকে জমিনে আগমন করার পর মওলার দরবারে অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন, অবশেষে নবীগণের ছরদার মুহাম্মদ (স:) এঁর অসিলা ধরে ফরিয়াদ করলেন, হে পরওয়ার দেগার! তোমার প্রিয়জন মুহাম্মদ (স:) এঁর অসিলায় আমাকে দয়া করুন। জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কিভাবে তাঁকে (মুহাম্মদ (স:))কে চিনলে? আদম (আ:) বললেন ইলাহী! বেহেশতে থাকাকালীন এক সময় উপরের দিকে তাকিয়েছি, দেখেছি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ”। অবাক হয়েছি কি যে ব্যাপার তোমার পবিত্র নামের সাথে মুহাম্মদ (স:) নামের এত যে দৃঢ় সম্পর্ক। বেহেশতের পাতায় পাতায় এমন কি বেহেশতের দরজায় পর্যন্ত এ মোবারকময় নাম মুহাম্মদ (স:) গাথা দেখেছি। সুতরাং তাঁর অসিলায় তোমার দুয়ারে দয়া ভিক্ষা



করিতেছি। তদন্তরে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করলেন- হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। মুহাম্মদ (স:) সৃষ্টির মধ্যে আমার অত্যন্ত মাহবুব! তুমি যখন তাঁর অসিলা ধরে ফরিয়াদ করেছ আমি তোমাকে বকসিশ করে দিলাম। এমন কি মুহাম্মদ (স:) না হলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না আর তোমার উপর দয়া করতাম না। (বায়হাকী শরীফ ইত্যাদি)

উক্ত হাদিসের আলোকে ইমামুল মোত্তাকীন হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ:) নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন- হে প্রিয় রাসুল (স:) আপনার শান ও মর্যাদা এত বিশাল যে, হযরত আদম (আ:), হযরত ইব্রাহিম খলিল (আ:) এবং হযরত মুসা নবী (আ:) সহ অনেক সম্মানিত নবীগণ পর্যন্ত আপনার নামের উচ্চালা নিয়ে করণাময়ের দরবারে প্রার্থনা করেছেন। (কছিদায়ে নোমানীয়া)

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমান নামে কিছু সংখ্যক নজদী মওদুদীর অনুসারী দুশমনে রাসুল, হযরত আদমের (আ:) সম্মান দাবী করে সত্য। অথচ তারা নবী, অলী বিশেষত: হুজুরে আকরামের (স:) অসিলা নেওয়াতে শিরিক বিদয়াত বলে ধর্ম প্রাণ মুসলমান সমাজকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে থাকে। তাদের জন্য উচিত যে, আদি গুরু আদম (আ:) মানবকুলের পিতা হয়ে আল্লাহর প্রিয় নবী হুজুর করিমের (স:) অসিলা নিয়ে রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করেছেন।

তদুপরি নবীর ছাহাবী হযরত ওসমান বিন হানিফ (রা:) থেকে বর্ণিত যে, একজন অন্ধ ছাহাবী রাসুলে পাকের (স:) দরবারে হাজির হয়ে তাঁর চক্ষু ফিরে পাওয়ার জন্য দোয়া চাইলেন, হুজুর নবী করিম (স:) তাঁকে দু' রাকাত নফল নামাজ পড়ে এইভাবে দোয়া করার জন্য আদেশ করলেন দোয়ার বাক্য এইভাবে- হে মওলা! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তোমার নবী মুহাম্মদ (স:) ঐর অসিলা নিয়ে যিনি রহমতের ভাণ্ডার নবী, হে আল্লাহ! তুমি তাঁর অসিলায় আমার সুপারিশ ও প্রার্থনা মঞ্জুর কর! অতঃপর তিনি দৃষ্টি শক্তি লাভ করলেন। (বায়হাকী শরীফ ও খোতবাতে বরতানীয়া ইত্যাদি)

এই ভাবে রাসুলে পাকের (স:) শুভাগমনের পূর্ব হতে আগমনের পরে এমনকি জাগতিক হায়াতের পরেও অনেকেই বিশেষত: নবীজির ছাহাবায়ে কেলাম প্রিয় নবীর অসিলা নিয়ে স্রষ্টার দরবারে দোয়া ফরিয়াদ করেছেন। তার অসংখ্য প্রমাণ কোরান ও হাদিসের কিতাব সমূহে উল্লেখ আছে। সুতরাং অসিলা হল: আশিয়া কেলাম আউলিয়ায়ে এজাম এবং আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন সমূহের মাধ্যমে বা তাঁদের নাম নিয়ে পরওয়ার দেগারের দরবারে আর্জি পেশ করা। নি:সন্দেহে ইহা পুণ্যময় ও কোরান হাদিস সম্মত।

প্রধান মুফতি, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।



সূফী তত্ত্ব ও সূফী সাধনায় ফানা ও বাকা

অধ্যাপক ড. মওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

সূফীতত্ত্ব তাসাউফের বাংলা রূপ। আরবী শব্দ তাসাউফ সাওফ থেকে নির্গত। এর অর্থ পশম। আর সূফী মানে যে পশমী কাপড় পরিধান করেন। সূফীগণ মোটা পশমী কাপড় পরিধান করতেন বলে তাদের সূফী বলা হয়। সূফীবাদ বা তাসাউফের ইতিহাস ইসলাম ধর্মের মতই পুরাতন। ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই সূফীবাদের বিকাশ ঘটে। তাসাউফ ইসলামের রূহ বা আত্মা। আর শরীয়ত হল এর দেহ বিশেষ।

সকল নবী রসুল ধ্যান মগ্ন থাকতে পছন্দ করতেন। এ কারণে বলা যায় সূফী সাধকের তত্ত্বের সূচনা আদি পিতা হযরত আদম (রাঃ) থেকে সূচিত হয়েছে। অবশ্য সূফী নাম হিজরী দ্বিতীয় শতকের পূর্বে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচিত না হলেও সূফী চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের পরিচয় এর বহুপূর্বেই পাওয়া যায়।

আল্লামা কুশাইরী তার আররিসালাহ গ্রন্থে বলেন- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ছিলেন প্রথম সূফী এবং তাঁর সাহাবীরা ও তাবেঈগণ ছিলেন এ তত্ত্বের অনুসারী। তবে তাঁরা সূফী অভিধা গ্রহণ না করে সাহাবী ও তাবেঈ উপাধি বেশি উপভোগ করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী হাজভেরী তাঁর কাশফুল মাহজুব গ্রন্থে হযরত আবুল হাসান থেকে বর্ণনা করেন- বর্তমানে তাসাউফ সারতত্ত্ববিহীন একটি নাম সর্বস্ব বিষয়। কিন্তু বিগত দিনে এটি ছিল পরিচয় বিহীন একটি বাস্তব বিষয়। আল্লামা হাজভেরী আরও বলেন- সাহাবী ও তাবেঈদের যুগে এ নামের অস্তিত্ব ছিল না অথচ এর সারতত্ত্ব প্রত্যেকের কাছে ছিল দেদীপ্যমান।

হযরত আলী (রাঃ) হতে তিন ধারায় সূফী তত্ত্বের বিকাশ লাভ করেছে। এক, যারা তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন। দুই, তাঁর পুত্র ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাঃ) এর বংশানুক্রমে। তিন, তাঁর অন্যান্য পুত্রদের বংশধারায়। ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর পুত্র ইমাম জয়নুল আবেদীন (রহঃ) এর আটজন পুত্র সন্তান ছিল। বিশেষত তাঁদের মাধ্যমে পরবর্তীতে তাসাউফের বিকাশ লাভ করে।

খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে তাসাউফের চরম উন্নতি সাধিত হয়। হযরত ফুদাইল ইবনে আযায (রহঃ) এর প্রধান খলিফা হযরত মারুফ কারখি(রহঃ) (৮০৮খৃ.) এবং তার শিষ্য হযরত সিররি সাকতি (রহঃ) (৮৫৭খৃ.) তাসাউফের প্রচারক ছিলেন। এ শতাব্দীতে আল মুহাসিবি (রহঃ) (৮৩০খৃ.) প্রথম সূফী তত্ত্বের উপর কিতাব রচনা করেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী(রহঃ) তার শিষ্য ছিলেন। এর পর জুনুন মিসরী(রহঃ) সূফী বুঝ ব্যবস্থাকে আরও উন্মুক্ত করেন। এসময় কতিপয় সূফী এমন কিছু গুপ্ত রহস্য বর্ণনা করেন যা প্রথমে মুসলিম সামাজিকে সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত করেছিল। এদের পুরোধা হলেন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী(রহঃ) (৮৭৪খৃ.)। তার “হামে উস্ত” তত্ত্বদ্বারা তিনিই প্রথম ফানাবাদের উন্মোচন করেন।

দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রখ্যাত সূফী সাধক জুনায়েদ বোগদাদী (রহঃ) (৯১০খৃ.) হযরত বায়েজিদের ফানাতত্ত্ব স্বীকার করে তার বাকা তত্ত্ব প্রচার করেন। এসময় তার শিষ্য মানসুর হাল্লাজের (রহঃ) ‘আনাল হক’ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে না পেরে জাহেরী আলেমরা তাকে কাজির বিচারের কাঠগড়ায় উপস্থাপন করেন।

হযরত মানসুর হাল্লাজের (রহঃ) যুক্তিটি এরূপ- একজন সূফী যখন আল্লাহর সাথে একাত্ম হন তখন তার এবং আল্লাহর মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না। আর তা থাকে না বলেই এ একাত্ম অবস্থায় সূফীর কোন পৃথক সত্তা বা বক্তব্য থাকে না। বরং স্বয়ং আল্লাহ তার মুখ দিয়ে কথা বলেন। অর্থাৎ, সূফী অভিজ্ঞতার চরম মুহূর্তে সূফী একজন ব্যক্তি



হিসেবে তার নিজেকে আল্লাহ বলে হাজির করেন না; বরং আল্লাহই সে সূফীকে তাঁর বাহন হিসেবে ব্যবহার করেন। হাল্লাজের এ বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনা যায় হযরত জুনাইদ বোগদাদীর (রহঃ) কণ্ঠে-তিনি বলেন, ত্রিশ বছর ব্যাপী আল্লাহ মানুষের জবানে জুনাইদের ভেতর দিয়ে লোক সমাজে কথা বলেন, আর জুনাইদ তখন কথা বলেননি। কিন্তু সমাজ তা বুঝতে পারেনি।

এরপর সূফী বুঝ ব্যবস্থার বিকাশ হতে থাকে। কিন্তু খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সূফীদের উপর এক চরম বিপর্যয় নেমে আসে। শরীয়তপন্থী আলেমরা সূফী বুঝ ব্যবস্থাকে ইসলামের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে। এ আন্দোলনে তারা তখনকার শাসকগোষ্ঠিকে দিয়ে সূফীদের উপর চরম আত্যাচার চালান। সূফীদের এমন যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন হযযাতুল ইসলাম ইমাম গায়ালী (১০৫০-১১১১ খৃ.)। তিনি শরীয়তের সাথে সূফী সাধনার সমন্বয় সাধন করে প্রায় চারশত কিতাব রচনা করেন। তিনি শরীয়ত মারিফাতের বিরোধ নিরিসন করে ইসলাম ধর্মের সঠিক কাঠামো তুলে ধরেন। এরপর শ্রেষ্ঠ তাপস অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সূফী সাধক গাউতুল আজম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (১০৭৭-১১৬৭খৃ.) রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আবির্ভাব হয়। তিনি কাদেরীয়া তরিকা প্রবর্তন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অনন্য আঙ্গিকে আবির্ভূত হন। জগতবিখ্যাত অলি খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (মৃত.১২৩৫খৃ.)। এ শতাব্দীতে বিখ্যাত অলি হযরত শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (মৃত.১২৩৩খৃ.) সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার প্রবর্তন করেন। এ শতাব্দীতে স্পেনীয় সূফী হযরত মুহিউদ্দিন আরবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (মৃত.১২৪৩খৃ.) সূফী বুঝ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্ব বিখ্যাত সূফী সাধক জালালউদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিও (মৃত.১২৭৩খৃ.) এ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি মৌলোভিয়া নামে একটি তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এরা ধর্ম নৃত্য ও ধর্ম সংগীতের একান্ত ভক্ত।

পরবর্তীতে সকল সূফী সাধক উল্লিখিত সূফীদের অনুসরণ করেন।

সূফী বুঝ ব্যবস্থার লক্ষ্য ও মূলনীতি:

সূফী সাধনার মূল লক্ষ্য আল্লাহর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর দীদার লাভ করা। পরম প্রেমময়ের সাথে মিলনই সূফী সাধনার মূল কথা। মাণ্ডকের সাথে মিলনের এই চরম পরিতৃপ্তি বস্তুজগতের কোন কিছুই দিতে পারে না। তাই জড়-জগতের ক্ষণস্থায়ী সুখ ও সম্পদের প্রতি সূফী সাধকের এক বিরাট উদাসীনতা, এক দারুণ অনীহা, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রলোভন ও ইন্দ্রিয়শক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় তারা নিয়োজিত হন। পার্থিব আসক্তি দূর হলে আধ্যাত্মিক প্রেম এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে। গায়ের আল্লাহ দূর হলে স্বয়ং আল্লাহ তায়াল্লা এসে সেই সিংহাসনে বসেন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ইনসান-ই-কামিল (পূর্ণ মানব) হতে হলে সূফীদের কতকগুলো মৌলিক নীতি অনুসরণ করে চলতে হয়।

তওবা (অনুতাপ), তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা), তাকওয়া (পরিবর্জন), সবর (ধৈর্য), ইখলাস (পবিত্রতা), শোকর (কৃতজ্ঞতা), রেজা (আত্মতৃপ্তি), যুহদ (বৈরাগ্য), খওফ (আল্লাহ ভীতি), ফকর (দারিদ্র্য), আদব (ভাল ব্যবহার), মহব্বত (আল্লাহ প্রেম), মোরাকেবা (ধ্যান), তাওহীদ (একত্ব), ইলম (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) প্রভৃতি সূফী তরীকার প্রাথমিক নীতি। সূফী জীবনে এগুলো প্রতিফলিত না করা পর্যন্ত মারিফাত ও হাকীকত লাভ হতে পারে না এগুলো লাভ করা বা এই নীতিমালা অনুসরণ করা তরীকতপন্থীদের অবশ্য কর্তব্য।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ৭টি বিষয় সূফী সাধনায় জড়িত- আত্মসমর্পণ, যিকির (স্মরণ), কাশফ (অতিন্দ্রিয় অনুভূতি), সামা (আল্লাহর প্রেমমূলক সঙ্গীত), হাল (ভাব বা অবস্থা), ফানা (আত্মবিলয়) ও বাকা (আল্লাহতে স্থিতি লাভ)।

(ক) আত্মসমর্পণ: আল্লাহতে পরিপূর্ণ সমর্পণই ইসলামের মর্মকথা। মুসলিম জীবনের ইহকাল ও পরকালের সবকিছু



আল্লাহরই জন্য সমর্পিত। সেজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, ‘(বল), আমার উপাসনা, আরাধনা, উৎসর্গ, অনুষ্ঠান, আমার জীবন-মরণ সমস্তই বিশ্বন্যস্ত আল্লাহরই জন্য।’ সুফীরা এই শাস্ত্রত বাণীর অনুসরণেই আত্মসমর্পনের বিশেষ নীতি মেনে চলেন। তারা আধ্যাত্মিক পথপরিক্রমার প্রারম্ভেই মুরশিদ বা পীরের নিকট আত্মসমর্পন করেন। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য প্রকাশ ব্যতীত যেমন কোন ছাত্রের শিক্ষা গ্রহণ সার্থক হতে পারে না, তেমনি সুফী সাধকের পক্ষেও স্বীয় পীর মুরশিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও পরিপূর্ণ অনুগত না হওয়া পর্যন্ত মারিফাত অর্জন সম্ভব নয়। এ সময় পীরের নিকট মুরিদ দুভাবে আত্মসমর্পণের ক্রিয়া সমাধা করেন।

প্রথমতঃ নিজের আখলাক ও নিজের ইচ্ছাকে ত্যাগ করে পীরের আখলাক ও ইচ্ছা গ্রহণ করেন। পীর নায়েবে নবী। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর গুণাবলী পীরের কাছেই বর্তমান। তাই তার আখলাক গ্রহণ করা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর আখলাকই গ্রহণ করার নামান্তর। দ্বিতীয়তঃ তাসাওরে শায়েখ বা পীরের সুরাত (চেহারা) ধ্যান। এখানে পীরের চেহারা এমনিভাবে ধ্যান করতে হয়, যেন মুরিদের নিজস্ব কোন চেহারা নেই। তাসাওরে শায়েখকে কোন কোন তরীকায় বরযাখ (আড়াল) বলা হয়। পীরের চেহারা ধ্যান করার সাধনে নূরই মুহাম্মদী লাভ হয় এবং নূর-ই-মুহাম্মদী ধ্যান করার মধ্য দিয়ে নূর-ই-তাজাল্লী লাভ হয়। এমনিভাবে সাধক পীরের কাছে আনুগত্য ও আত্মসমর্পনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের শিক্ষা গ্রহণ করেন। সাধারণ উচ্চমার্গে সুফী নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে বিলীন করে দেন। এভাবে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সুফী সাধক আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

(খ) যিকিরঃ আল্লাহর স্মরণকে যিকির বলে। সাধারণত আল্লাহর কোন নাম বা কুরআনের কোন আয়াত পুণঃ পুণঃ আবৃত্তি করার নাম যিকির। কুরআনে বলা হয়েছে, “ফাযকুরুনী আযকুরুকুম” অর্থাৎ তুমি আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাকে স্মরণ করব। অন্যত্র, “হে বিশ্ববাসিগণ! যত বেশী সম্ভব আল্লাহর যিকির কর, আর সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা কীর্তন কর।” কুরআন ও হাদীসে যিকির করার উপর বহু আয়াতে জোর দেয়া হয়েছে। যিকির সাধারণতঃ দু প্রকারঃ যিকিরে জলী বা উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম আবৃত্তি এবং যিকিরে খফী বা নীরবে আল্লাহর নাম আবৃত্তি। যিকিরে খফীর মর্তবা বেশী। সুফী যাকের (স্মরণকারী)-কে আল্লাহতে লীন হয়ে থাকতে চার প্রকার যিকিরের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। যথা :

(১) যিকিরে লিসানী অর্থাৎ মুখ ও জিহ্বার দ্বারা আল্লাহর বিশেষ নাম উচ্চারণ বা আয়াত বারবার আবৃত্তি করা। কুরআন পাঠ, হাদীস ও দীন সম্পর্কে আলোচনা এবং আল্লাহ ও রসূল সম্পর্কিত কবিতা ও গয়ল পাঠ যিকিরে লিসানীর অন্তর্গত।

(২) যিকিরে কালবী অর্থাৎ কলব (হৃদয়ের) এর দ্বারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা। এতে কলব এর আবর্জনা দূরীভূত হয়ে কলব আয়নার ন্যায় পরিষ্কার হয়, নূর-ই-তাজাল্লীতে কলব এর আবর্জনা দূরীভূত হয়ে কলব আয়নার ন্যায় পরিষ্কার হয়। নূর-ই-তাজাল্লী কলব এর উপর প্রতিফলিত হয়ে যাকেরের আধ্যাত্মিক চোখে তা দৃশ্যমান হয়ে উঠে।

(৩) যিকিরে আনফাসী বা শ্বাস-প্রশ্বাসের যিকির। এই যিকিরের মর্তবা খুব বেশী। শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাই এই যিকিরের নিয়ম। খেয়ালের মোকামের সাথে যিকিরে আনফাসীর যোগসূত্র রয়েছে। এই যিকিরের দ্বারা সুফীরা সর্বদা আল্লাহর নাম স্মরণ করেন।

(৪) যিকিরে আয়নী বা চোখের যিকির। যিকিরকারীর এটাই হচ্ছে চরমতম ও উচ্চতম মার্গের যিকির। নূর-ই-তাজাল্লীকে দর্শনই এই যিকিরের মূল উদ্দেশ্য। কুরআনে এই যিকির সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, “ফাআয়নামাতুয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ।” অর্থাৎ ‘তুমি যেদিকেই তাকাও, আল্লাহর মুখ সেদিকেই বর্তমান। সব সময় আল্লাহকে আধ্যাত্মিক চোখে স্মরণ করাই এই যিকিরের কাজ। এই যিকিরের মোকাম উত্তীর্ণকারী সুফী আল্লাহর



প্রথম শ্রেণীর আওলিয়া শ্রেণীভুক্ত।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” ও “আল্লাহ” এ দুইটি সাধারণতঃ যিকিরের মাধ্যমে বারবার আবৃত্তি করা হয়।

স্বীয় সত্ত্বা বিস্মৃতি হয়ে আল্লাহতে ফানা হয়ে থেকে তাঁর মিলন সুখ পান করাই যিকিরের মূল উদ্দেশ্য।

(গ) কাশফ বা অতিন্দ্রিয় অনুভূতি: সুফী বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী কাশফ বা সজ্ঞা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই সাধক আল্লাহকে জানতে পারেন। কাশফ এমন এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি, যার সাহায্যে সাধক ভূত ভবিষ্যত জগতের দৃশ্য, অদৃশ্য, আত্মা, আল্লাহর যাত ও সিফাতকে জানতে প্রয়াস পান। পীর-ই-কামিলের ফয়েজ (জ্ঞানালোক) ও তাওয়াজ্জুহ কাশফ বা অন্তর্দৃষ্টি লাভের অপরিহার্য প্রাথমিক অবস্থা।

কাশফ দুই প্রকার: যথা- কাশফে কাওনী ও কাশফে ইলাহী। ভবিষ্যত কালের বা দূরবর্তী স্থানের দৃশ্য বা অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়াকে কাশফে কাওনী বলে। সলুক বা শিক্ষা নির্দেশনা সম্পর্কে, যাত ও সিফাত সম্পর্কে ইলম এবং মারিফাতের কোন সুক্ষ্ম বিষয় অন্তঃকরণের মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া বা আধ্যাত্মিক জগতের কোন জ্ঞান আল্লাহর তরফ হতে প্রাপ্ত হওয়াকে কাশফে ইলাহী বলে।

প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সূফীকে আল্লাহ সম্পর্কে কোন বাস্তব জ্ঞান দিতে পারে না। শুধু কাশফই সূফীকে আল্লাহর বাস্তব জ্ঞান দিতে সক্ষম। সূফী যখন আপন নশ্বর অস্তিত্ব বিলোপ করে ফানাফিল্লাহর গভীর তন্ময়তার মধ্যে বিদ্যমান হন, তখন তার অসীম অস্তিত্বের জ্ঞান অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হিসাবে দিল দরিয়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। সাধনার উচ্চমার্গে সূফী কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহর অসীমতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, হারিয়ে ফেলেন জাগতিক সর্বপ্রকার জ্ঞান ও অনুভূতিকে; নিজেতে বিস্মৃত হন অসীমতার নিবিড় প্রেম স্পর্শে গিয়ে এবং এই মুহূর্তেই সূফী আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ করেন। সূফীদের নিকট কাশফলব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

(ঘ) সামাঃ আল্লাহর প্রেমমূলক সঙ্গীতকে সামা বলে অবিহিত করা হয়। হামদ (আল্লাহর স্তুতি), না'ত [হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামা এর প্রশস্তি] গযল (আল্লাহর প্রেমমূলক গান), মুরশিদী (পীর ও মুর্শিদ সম্পর্কিত সঙ্গীত), মারিফাতী (তত্ত্বমূলক গান), কাওয়ালী (হামদ না'ত, গযল, মুরশিদী প্রভৃতির রাগ ও ভাবপ্রধান সঙ্গীত), আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, দেশ প্রেমমূলক সঙ্গীত প্রভৃতিকে সামা বা বিশুদ্ধ সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। হযরত গায্বালী (রা.) সঙ্গীতকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন; যথাঃ- ১.মুবাহ্ ২.সডাব বর্ধক ও ৩.হারাম। উপরে বর্ণিত সামাসমূহ শ্রবণ করা মুবাহ ও সডাব বর্ধক পর্যায়ে অন্তর্গত। যে গান বাজনা অশ্লীলতা আছে, যৌন উদ্দীপক এবং মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে তা সম্পূর্ণ হারাম ও পরিত্যাজ্য। সূফীদের মধ্যে সবাই সঙ্গীত প্রিয় নন। আধ্যাত্মিক সঙ্গীত বা সামার দ্বারা অন্তরে আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে জাগিয়ে এবং আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট করাই এই সঙ্গীতের আসল কাজ। কোন কোন সূফী সাধক এই সঙ্গীতকে ‘রুহানী গেয়া’ বা আত্মার আহ্ব্য বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে, সামা এর শ্রবণকারীকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে টেনে নিয়ে যায় এবং মুহূর্তে সাধকের মনে আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তোলে। সামা প্রকৃত শ্রবণকারীকে ‘জজবার’ (ভাবনোদনা) পর্যায়ে নিয়ে যায়। সাধারণতঃ চিশতীয়া ও মৌলবীয়া তরীকার সুফিগণ সামা শ্রবণ করে থাকেন।

উপরিউক্ত শর্ত চারটি পূর্ণ হলে তবেই সামা জায়েয (বৈধ), নতুবা নয়। মোটকথা স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে সামা বৈধ এবং তা আল্লাহ প্রেমিকদের আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতির উদ্দীপক।

(ঙ) হালঃ সূফীর ভাবানুভূতির বা আধ্যাত্মিক ও মানসিক এক বিশেষ অবস্থাকে “হাল” বলা হয়। সালিকের অন্তর রাজ্যে যখন আল্লাহর মহব্বতের বিশেষ নূর সৃষ্টি হয়, যা সূফীকে কাশফের মাধ্যমে সত্যের স্বরূপকে জানতে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতি তরঙ্গের সৃষ্টি করে তাকেই সাধারণতঃ ‘হাল’ বলা হয়। ‘হাল’ কাশফের অব্যবহিত



পূর্বাবস্থা। হাল সূফীমনের এমন এক ভিত্তি, যার উপর হৃদয়ানুভূতি বা আন্তর্দৃষ্টি গড়ে উঠে। যা ফানাফিল্লাহ অবস্থা লাভের জন্য বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কেউ ইচ্ছা করলেই ‘হাল’ লাভ করতে পারে না। হাল আল্লাহর অনুগ্রহ ও অসীম দয়ার উপর নির্ভরশীল। হাল লাভ করার পর তাকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা সাধক করতে পারেন এবং যখন তা দীর্ঘায়িত ও স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন একে ‘মাকামাত’ বলা হয়। হালের বাহ্যিক বিকাশ হাসি, কান্না, উচ্ছ্বাস, হাহতাশ, উদাসীনতা, বৈরাগ্য প্রভৃতির মাধ্যমে ঘটে থাকে। আর এক শ্রেণীর হাল আছে, যাতে এই সব অবস্থা প্রকাশ পায় না, বরং সাধক চুপচাপ ও নিরিবিলি নিস্তব্ধ ভাব সাগরে নিমজ্জিত হতে থাকেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই হাল শ্রেষ্ঠতর। হাল সূফীর আধ্যাত্মিক জীবনের এক চরম ও নিবিড় অভিজ্ঞতা।

(চ)ফানাঃ ‘ফানা’ অর্থ আত্মবিনাশ। এই আত্মবিনাশ মানে আত্মার ধ্বংস নয়। কেননা আত্মা অমর, শাস্বত ও চিরন্তন। আত্মগরিমা, আত্ম অহংকার, হিংসা বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, রিয়া, লোভ, লালসা, কামনা, নিন্দা, দুনিয়ার ভালবাসা প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা, গুণ ও কার্যাবলীকে পরিত্যাগ করা, মানবিক দুর্বলতা ও আত্মবোধকে ধ্বংস করা এবং তৎপরিবর্তে আল্লাহর গুণাবলী লাভ করা, যার অর্থ আল্লাহর সিফাতের মধ্যে মানবিক সিফাতকে বিলীন করে দেওয়া এবং সর্বশেষে আল্লাহর অসীম জাতের মধ্যে বান্দার সসীম সত্তাকে লীন করে থেকে নিজ অস্তিত্ববোধকে ভুলে যাওয়াকে ‘ফানা’ বলে অভিহিত করা যায়। মোট কথা, যখন সূফী নিকাম বা কামনাশূন্য হয়, তখন তার কামনাশূন্য অন্তর আল্লাহময় ভাব ধারণ করে। সেজন্য সমুদয় সৃষ্টিকে ও দুনিয়ার ভালবাসাকে মনের সর্বপ্রকার কামনা ও ইচ্ছাকে বিদূরিত বা ফানা করে নিজস্ব অস্তিত্ববোধকে হারাতে পারলেই ফানা হওয়া সম্ভব। সমুদয় সৃষ্টি হতে ফানা হওয়ার অর্থ এই যে, সংসারের কোন মানুষ, জীব বা কোন কিছুই এ অবস্থায় সূফীকে আকৃষ্ট করতে পারে না। পার্থিব সর্বপ্রকার লোভ ও আশাকে হত্যা করে আসক্তি লিপ্সার পরিবর্তে নিঃসঙ্গতা পছন্দ করেন। সংসার, লাভ, ক্ষতি ও উপার্জনের প্রতি তার চেষ্টা, যত্ন বা চিন্তা থাকে না এবং এসময় সাধকের আত্মকেন্দ্রিকতা ধ্বংস হয়ে যায়। সাধক সমুদয় ব্যাপারে এসময় আল্লাহর উপর নির্ভর ও আত্মসমর্পণ করেন। সর্বাপেক্ষা কামনা ও ইচ্ছা (ইরাদা) হতে ফানা প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এসময় সাধকের কোন নিজস্ব উদ্দেশ্য বা খাৎস থাকে না। একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া সূফী এসময় আর কিছু চান না। ভাল-মন্দ, সুনাম, দুর্নাম, কোন কিছুতেই সাধকের মনোভাবে কোন পার্থক্য বা পরিবর্তন ঘটে না। আপন-পর বলে কোন পার্থক্যই সাধকের মনে এসময় থাকে না। আল্লাহর অসীম ইচ্ছাতেই তার সামান্য ইচ্ছা সমর্থিত হয়। এভাবে নফসের পার্শ্বিক (নফসে আন্মারা) প্রবৃত্তি ও মানবিক দুর্বলতাগুলি ধ্বংস হলে তা আল্লাহর সম্মিলনের (ওয়াসিল) উপযুক্ত হয়। এ ফানা সম্পর্কেই হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মৃত্যু কাবলা আন তা-মৃত্যু” অর্থাৎ ‘মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুবরণ কর’। এ মৃত্যু বা ফানা বরণ করতে হলে প্রেমই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম। প্রেম ব্যতীত কেউ এই ফানার স্তরসমূহ উত্তরণ করতে পারবে না। তাই নিজ অস্তিত্ববোধকে অসীম অস্তিত্বের মাঝে হারানোর জন্য সাধক এ সময় প্রেম মদিরা পান করেন। হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) এজন্যই বলেছেন:

জুমলা মাশুক আস্ত আশেক পর্দাহি
জিন্দা মাশুক আস্ত আশেক মূর্দাহি

অর্থাৎ, সমুদয়ই মাশুক-আশেক এক পর্দা মাত্র, আর জীবিত আশেক মৃত্যু তুল্য। বিশ্বসংসারের সমস্ত কিছুই ফানা (ধ্বংস) হবে, একমাত্র আল্লাহই চিরজীবী, চিরবিদ্যমান। আল্লাহর চৈতন্যময় অস্তিত্বের মাধ্যমে সৃষ্টির সবকিছুই লয়প্রাপ্ত হয়ে আপন অস্তিত্ব খুঁজে পাবে। অর্থাৎ প্রেমিক প্রেমাস্পদের প্রেমসাগরে নিমজ্জিত হয়ে অসীম সাগরের ইচ্ছা ও শক্তি প্রাপ্ত হবে। সেজন্য মাওলানা রুমী (রা.) বলেন:



কে জা-এ-কে দরিয়ান্ত মান কিন্তুম
গর উহস্থ হক্কা কি মান নিন্তম।

অর্থাৎ “যেখানে সাগর আছে সেখানে আমার (বিন্দু) কি মূল্য আছে? কারণ সে যখন আছে, তখন আমি কিছুই নই।”

হামসা আনাসির তাজাল্লি নুর জামাল হতে সিফাত বা আসমানী সিফতে উন্মেষিত প্রকাশ পায়। সাধ্যসাধনার সাহায্যে সাধকের আমিত্ব (আনাইয়াত) আল্লাহর আমিত্বের সাথে লীন হয়ে অসীমত্ব লাভ করে।

এই ফানা লাভ করতে চারটি সোপান পার হতে হয়। যথা : ১. ফানা ফিন নফস বা ফানা ফিল ওজুদ, ২. ফানা ফিশশায়েখ, ৩. ফানা ফির রসূল, ৪. ফানা ফিল্লাহ।

১. ফানা ফিন্নফস বা ফানা ফিল ওজুদ: যাবতীয় নফসে আম্মারা, কু-প্রবৃত্তি, দৈহিক-জাগতিক সর্বপ্রকার ইচ্ছা, কামনা ও আকর্ষণ ধবংস করাই ফানার এই প্রথম স্তরের কাজ। অহং সম্পর্কিত সকল কিছুই পরিবর্তন করে ঐশী গুণাবলী লাভ করাই এ স্তরের লক্ষ্য।

২. ফানা ফিশশায়েখ: এ স্তরের সূফী সাধক পীরের নিকট সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করেন। পীরের গুণাবলী লাভ করা এবং নিজস্ব ইচ্ছা ও কামনা পীরের ইচ্ছায় পরিণত করাই এই স্তরের উদ্দেশ্য। পীরের সাথে মহব্বত সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। এ স্তরে তাসাওরে শায়েখ বা পীরের চেহরা ধ্যান করা ও উক্ত ধ্যানের মাধ্যমে আপন অস্তিত্ব বিলোপ করে পীরের অস্তিত্বে স্থিতিবান হওয়ার জন্য সূফী শিক্ষকগণ নির্দেশ দান করে থাকেন। এই স্তরে সূফী শিক্ষকগণ চার প্রকার তাওয়াজ্জু (প্রভাব) দিয়ে থাকেন মুরিদকে। যথা : ১. ইত্তিহাদী, ২. ইকতিসাদী, ৩. ইলকায়ী ও ৪. ইনকাসী। এতে পীরের সাথে মুরিদের রাবেতা (মহব্বত জনিত) মিলন বৃদ্ধি পায়।

৩. ফানা ফির রসূল: ফানা ফিশ্ শায়েখ লাভের পর ফানা ফির রসূলের স্তর শুরু হয়, এ স্তরে সালিক রাসূলের সর্বপ্রকার গুণাবলী লাভ ও তার মহব্বত লাভ করার জন্য সাধনা শুরু করেন। ধ্যানের মাধ্যমে তিনি এই সময়ে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চেহরা নুর-ই-মুহাম্মদীর সাক্ষাত লাভ করেন। মুরাকেবা বা ধ্যানের মাধ্যমে সাধক এ স্তরে আপন অস্তিত্বকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর নুর-ই-মুহাম্মদীতে বিলীন করে দিয়ে ফানা ফির রসূল লাভ করেন।

৪. ফানা ফিল্লাহ: ফানা ফির রসূল লাভের পর নুর-ই-মুহাম্মদীর মাধ্যমে নুর-ই-তাজল্লী লাভ হয়। নুর-ই-তাজল্লী দীদারের মাধ্যমে সাধক ধ্যানের উচ্চতম পর্যায়ে উপনীত হন। এ স্তরে সূফী ধ্যান ও তন্ময়তার মাধ্যমে ব্যক্তিগত আত্মচেতনাকে মুছে দিয়ে জাতের অসীম চেতনায় উপনীত হন এবং সাধকের ব্যক্তিগত চেতনাই আল্লাহর মুরাকাবা ও প্রেমে সমাহিত হয়। একে ফানা ফিল্লাহ বলে।

চতুর্থ স্তর ফানা ফিল্লাহর উপরে আর একটি মোকাম রয়েছে। এর নাম ফানাউল ফানা। ফানাউল ফানা এই যে, ফানার মাধ্যমে সালিক যে নিজের ও সমুদয় সৃষ্টির অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেললেন, সে চিন্তা বা বোধও এখানে লোপ পায়।

ফানার এই স্তরসমূহ পাড়ি দিতে পারলেই তবে তিনি আল্লাহর বন্ধু বা ওলী আল্লাহ পদবাচ্য হন।

ফানার স্তরগুলি নৈতিক ও গভীর আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রদীপ্ত। এই স্তরে আত্মবিনাশের মাধ্যমে আল্লাহ প্রাপ্তি ঘটে।

৫. বাকা: আল্লাহতে স্থিতিলাভ করার নাম বাকা বা বাকা বিল্লাহ। ফানা ফিল্লাহ অবস্থায় যখন সূফী সাধক স্বীয়



অস্তিত্ববোধ হারিয়ে ফেলেন, আপনাতে আপনার কিছুই থাকে না, তখন সেখানে স্বয়ং আল্লাহই বিরাজ করেন। যেমন একটি পাত্রে যখন পানি থাকে তখন সেখানে বায়ু থাকে না। কিন্তু পাত্রে পানি না থাকলে বায়ুতে সে পাত্র পূর্ণ রাখে। তেমনি, নফসের পাশবিক প্রবৃত্তি, মানবিক দুর্বলতা ও অস্তিত্ববোধ দূরীভূত হলে সেখানে আল্লাহর গুণাবলী, ফিতরাতুল্লাহ বা আল্লাহর ফিতরাত (প্রকৃতি ও স্বভাব) ও তার অস্তিত্বের অনুরূপ রূপ নেমে আসে। সেজন্যই ফানা ফিল্লাহর স্তর নঞর্থক বা (Negative) ; পক্ষান্তরে বাকা বিল্লাহ সদর্থক বা (positive) ফানা ফিল্লাহতে ধ্বংস, বাকা বিল্লাহতে পুনর্জীবন লাভ। আপনাতে আপনি পূর্ণ থাকলে আল্লাহর স্থান কোথায়? সে জন্য আপন অস্তিত্ববোধ বিধ্বস্ত হলেই সেখানে জাত পাক বিকশিত হয়ে উঠেন। অন্য কথায় মানব আত্মা তখন অসীম যাতে অসীমত্ব লাভ করে। এজন্যই হযরত শাহ বু-আলী কলন্দর (রঃ) বলেন:

তা-তুরী ইয়ারে গরদাদ ইয়ারে তু
চুঁ নাবাশী ইয়ারে বাশদ ইয়ারে তু।

অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার তুমিত্ব জীবিত থাকবে, ততক্ষণ তুমি মাণ্ডক (আল্লাহ) কে পাবে না; যখন তোমার তুমিত্ব থাকবে না, তখনই তোমার আল্লাহ প্রাপ্তি ঘটবে।

কাজেই দেখা যায়, ফানা পর্যন্ত দ্বৈতভাব বজায় থাকে, আমি ও তুমি- এ দুয়ের চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই থাকে। কিন্তু বাকা বিল্লাহ লাভ করলে দু'ভাব আর থাকে না- এখানে জাতের মধ্যে সিফাত মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। জাতের মধ্যে সিফাত থাকে বটে, কিন্তু তা গুপ্ত অবস্থায়। এসময় পৃথক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। কেননা, উছদিয়াতের (জাতের জগত) স্তরে সকল কিছুই জাতের রং ধারণ করে, যেমন অগ্নিতে কোন কিছু পতিত হলে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও রং হারিয়ে ফেলে অগ্নির বৈশিষ্ট্য ও রং (গুণ) ধারণ করে। পতঙ্গ যেমন আগুনের প্রেমে মত্ত হয়ে আগুনে আত্মবিসর্জন দিয়ে আগুনের গুণ ও সত্তা লাভ করে, তেমনি মানবাত্মাও পরমাত্মার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে পরমাত্মার লা-মাকান লাভ করে জাতেরই মধ্যে আত্মবিসর্জন করে এবং জাতের অসীমত্বের মধ্যে অসীম গুণ ও সত্তা লাভ করে অসীম রূপ

ধারণ করে। অন্য কথায় অন্তরে সসীমের কোন স্থান নেই। তখন সসীম থাকে না, একমাত্র অসীমই থাকে। এ স্তর সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন, “কুল্লু শাইয়ান হালিকুন ইল্লা ওয়াজহুহু” অর্থাৎ “আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।” এমন এক অবস্থা, সেখানে আলম-ই-নাসুত (জড়গত) বা আলম ই- লাহুতের কোন বোধ নেই; সেখানে আধ্যাত্মিক জগত তথা অন্য কোন জগতও নেই। এখানে নেই কোন অস্তিত্ব নেই কোন অনস্তিত্ব; এখানে আছে বা নাই- এ কিছুই বলা যায় না। এখানে কোন ভাষাও কুলায় না, ইঙ্গিতও চলে না। এ জগতের কোন উপরও নেই, কোন নীচও নেই। এ ভুবনের কোন সংবাদ, কোন চিহ্ন নেই। এ জগত বে-নিশান, বে-মিছাল (উপমাবিহীন)। একমাত্র অসীমই এ অসীম জগতের মর্ম বোঝেন। খামসা আনাসিরের (পঞ্চভূত) তাজাল্লি নূর জালাল হতে আসমায়ে সিফাত উন্মেহাত প্রকাশ প্রায়। সালিকের সাধ্য-সাধনা, ধ্যান-ধারণা, মোরাক্বে ও মোশাহেদার সাহায্যে স্বীয় আমিত্ব (আনাইয়াত) অসীম জাত ইলাহি আল্লাহর আমিত্বের (আনাইয়াতের) সাথে মিশে থেকে সালিক এক অভিনব জীবন লাভ করেন, মৃত্যুর পর জীবিত হন অর্থাৎ ফানার পর বাকা হাসিল করেন। বাকাপ্রাপ্ত হলে তখন আল্লাহর অনুভূতিই সাধকের অনুভূতি, আল্লাহর অসীম চেতনাবোধই তার মহাচেতন্য। বাকাতে সাধক ও ষড় ঋপুর বৈচিত্র্যময়, অনিত্য, পরিবর্তনশীল ও নৈসর্গিক জড়জগত থেকে আল্লাহর অসীম, নিত্য ও মহাজগতে পাড়ি জমান। এ সময় তার অস্তিত্ব আল্লাহর অসীম অস্তিত্বের সাথে একান্ত ও একক অবস্থায় অনুভব করেন। এখানে দুই এর কোন রূপ, চিন্তা বা বোধ নেই। এই একত্ব ও একাত্মবোধকেই তওহীদ বলে। যেমন মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন:



তুসরো গোম শওকে তওহীদ ই বুয়াদ
গোম সোদন গোম কনকে তফরিদ ই বুয়াদ।

অর্থাৎ “তারই ধ্যানে হারিয়ে যাও একেই তাওহীদ বলে, আপনা হারা ও হারিয়ে ফেলা একেই তফরিদ বলে।” এবং পবিত্র কালাম পাকেও আল্লাহ বলেন: “লা ইলাহা।” অন্য কথায় এই স্থানে আমি (আল্লাহ) ব্যতীত কেউ নেই। সুফী সাধকের এ হলো চরম অনুভূতি ও পরম প্রাপ্তি। এই স্তর সম্পর্কেই জাত পাক আল্লাহ পবিত্র হাদীস-ই-কুদসীতে বলেছেন, “ইল্লাল্লাহা তায়ালা কালা মান আদালী ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতু লাহু বিল হারবে ওয়ামা তাকাররাবা ইলাইয়া আবদী বেশাইয়েন আহব্বা ইলাইয়া আফতারাজতু আলাইহে ওয়ামা ইয়াজালু আবদী ইয়াতাকাররাবো ইলাইয়া বিননাউয়াফলে হাত্তা আহবাবতুহু ফাইযান আহ বাবতুহু ফাকুনতু সামায়াহুলাজি ইসামাযুবুবিহি ওয়া বাসারহুলাজি ইয়াবসিরুবিহি ওয়া ইয়াদাহুলাজি ইয়াবতাও বিহি ওয়া রিজলাহুলাজি ইয়ামশি বিহা। অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, “যারা আমার অলীদের সাথে শত্রুতা রাখে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। খবরদার! যখন আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে বন্ধু জানি। যখন আমি তাকে বন্ধু জানি এমতাবস্থায় যে, আমি তার কর্ণ হই, যদ্বারা সে শ্রবণ করে; আমি তার চক্ষু হই, যদ্বারা সে দর্শন করে; আমি তার হস্ত হই, যদ্বারা সে ধারণ করে; আমি তার পদযুগল হই, যদ্বারা সে হেটে বেড়ায়।” এ স্তরে সাধকের স্বীয় অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্বে স্থিতিলাভ করে এবং তার সত্তা ও গুণ তখন স্বয়ং আল্লাহই হয়ে যায়।

মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব রুহ। রুহ আল্লাহর আমর (আদেশ বা নির্দেশ বিশেষ)। আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক (মাটি) ও বাদ (বাতাস)- এই আরবা আনাসির বা চতুর্ভূত আলমই খালকের অন্তর্গত; পক্ষান্তরে খামসা আনাসিরের একমাত্র রুহ (সাফা) আলম-ই-আমর এর অন্তর্গত। আলম-ই-খালক ধবংসশীল এবং আলম-ই-আমর আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী অসীম জাতের (সত্তার) কুদরত (শক্তি) বিশেষ। তাই, জাতের কাছে ফিরে গিয়ে জাতের মধ্যে লীন হয়ে থাকাই রুহের মূল উদ্দেশ্য। এজন্যই পবিত্র কুরআন পাকে ঘোষণা করা হয়েছে, ‘ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’ অর্থাৎ আমরা আল্লাহর দিক থেকে এসেছি এবং আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া, আল্লাহতেই সমাহিত ও বিলীন হওয়া এবং তাতেই পুনর্জীবন লাভ করা রুহের বা আত্মার আসল লক্ষ্য। বাকাবিল্লাহতে সুফীর এই পুনর্জীবন লাভ হয়। এসময় আল্লাহই সাধকের মাধ্যমে স্বীয় কর্ম সম্পাদন করেন। এ স্তরে তাই সাধারণ মানুষের কথা, কাজ ও হাবভাবের সাথে সুফী সাধকের কথা, কাজ ও হাবভাবের পার্থক্য ও ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে বের হয়েছিল, “আমিই মহাকাল।” এবং “মান রায়ানী ফাকাদ রায়াল হাক্বা” অর্থাৎ যে আমাকে দেখল, সে হক (পরম সত্যকেই) দেখল।

এ স্তরে হযরত আলী (ক:) এর মুখনিঃসৃত বাণী, “হাযাল কুরআনু সামিতুন ওয়া আনাল কুরআনু নাতিকুন” অর্থাৎ ‘এ কুরআন নির্বাক, এবং আমি সবাক (জীবন্ত) কুরআন।’ বাকাবিল্লাহর স্তরে আরোহনপূর্বকই হযরত মনসুর হাল্লাজ (রঃ) এর মুখে বের হয়েছিল, “আনাল হক” বা “আমিই হক বা সৃষ্টিশীল পরম সত্য আল্লাহ।” হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ) এর মুখে শ্রুত হয়েছিল, “মহিমা আমারই।” এতদ্ব্যতীত সুফীশ্রেষ্ঠ হযরত আমীর খসরু (রহঃ) এই স্তরে আরোহন করেই বলেছেন :

মানতু শুদম তু মান শুদি মানতান শুদম তু জাঁ শুদি।

তাকশ না গোয়েদ বাদ আজই মানদিগর তু দি গরী।

অর্থাৎ “আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে, আমি দেহ এবং তুমি প্রাণ, এরপর যেন কেউ বলতে না পারে যে, আমি একজন আর তুমি আর একজন।” এ স্তরের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:



আল্লাহ আল্লাহ গোফতে আল্লাহ মিশওয়াদ
ইশখুনকায় বাওর মরদম শওয়াদ।

অর্থাৎ “আল্লাহ আল্লাহ জপতে জপতে মানুষই আল্লাহময় হয়ে যায়; এ কথা কি করে সাধারণ লোক বিশ্বাস করবে?

বাকার এই স্তরেই হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাঃ) ঐর মুখনিঃসৃত বাণী হলোঃ

খাওয়াহীকে রাখম বানীদার বেহারা মান বানগর
মান আয়না ওয়েম ও সিস্ত খোদা আজ মান।

অর্থাৎ “তুমি যদি আল্লাহর মুখ দর্শন করতে চাও, আমার চেহারার দিকে তাকাও। আমি তার দর্পণ, সে আমা হতে পৃথক নয়।” হযরত আবু বকর শিবলী (রাঃ) এ স্তরেই বলেছিলেন- ‘আমিই কথা বলি আর আমিই শুনি, এ পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।”

বাকাবিল্লাহ সাধকের সর্বশেষ স্তর। মোটকথা এই স্তরে সূফী সাধক আল্লাহর চিরন্তন, শাস্ত ও অসীম সত্তায় স্থায়ীভাবে স্থিতি লাভ করেন। সাধক এ স্তরে কুতুব, গাউস, আরিফবিল্লাহ প্রভৃতি লকব ও সম্মানের অধিকারী হন। তিনি এ স্তরে অমরত্ব লাভ করে চিরজীবী ও চিরজীব হন। এ সময় জীবন ও মৃত্যু তার ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। তিনি এ স্তরে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহময় হয়ে যান। মূলতঃ বাকাবিল্লাহ আল্লাহতে সাধকের চিরন্তন স্থিতিলাভেরই নামান্তর।

এ স্তরে সাধক মোশাহেদায় ও সাধারণ অবস্থায়, নিদ্রা ও জাগরণে সর্ব অবস্থায়ই একমাত্র আল্লাহকেই প্রত্যক্ষ করেন, উপলব্ধি করেন; তাওহীদের রূপ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই এ স্তরে বিদ্যমান থাকে না।

উপসংহার: সাধারণত মুসলমানরা আল্লাহর ভয়ে ইবাদত বন্দেগী করেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা মহা পরাক্রমশালী এবং একমাত্র প্রভু, সেহেতু তিনি পুণ্যবানকে জান্নাত ও পাপীদের দোযখ দেবেন। কাজেই সাধারণ মুসলমানরা বেহেশতের লোভে ও দোযখের ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন। এরা মনে করেন আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে একটি মাত্র সম্পর্ক তা হল প্রভু-ভৃত্য। পক্ষান্তরে সূফীগণ আল্লাহর সাথে বহুবিধ সম্পর্ক কল্পনা করেন। তন্মধ্যে আশেক মাস্তকের সম্পর্কই প্রধান। সূফীরা আল্লাহকে মাস্তক বা প্রেমাস্পদ মনে করেন। আর নিজেদের তাঁর আশিক বা প্রেমিক মনে করেন। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য, তাঁর মিলন সুখ পানের জন্য সূফী ইবাদতে মশগুল হন। জান্নাতের লোভ বা দোযখের ভয় তাকে মোটেই বিচলিত করতে পারে না। আল্লাহকে লাভ করে আল্লাহর মাঝে লীন হয়ে আল্লাহময় হওয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এখানে জড়জগতের কোন চিন্তা তার নেই। এজন্য সূফীদের ইবাদত নিক্রাম ও স্বার্থশূন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সূফীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এরূপ স্বার্থহীন ইবাদত করার তাউফিক দান করুন। আমিন

সহযোগী অধ্যাপক : আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১। কেউ কেউ মনে করেন, আরবি সাফা শব্দ থেকে তাসাউফের উৎপত্তি। এর অর্থ হলো পবিত্রতা লাভ করা। যেহেতু সূফীগণ আল্লাহর পরিশুদ্ধি লাভের সাধনায় ব্রত হয়ে পবিত্র জীবন যাপন করেন বিধায় তাদেরকে সূফী বলা হয়। কেউ কেউ মনে করেন এটি গ্রিক শব্দ সুফিয়া থেকে নির্গত। গ্রিক ভাষায় সুফিয়া শব্দের অর্থ হল- প্রজ্ঞা। যেহেতু সূফীরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ধরণের প্রজ্ঞার মালিক হন তাই তাদের সূফী বলা হয়।



আউলিয়া-এ-কামেলীনগণের সুহবতের গুরুত্ব ও উপকারিতা

আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা (এম. এম.)

মানুষের ব্যক্তি জীবনে তার চলার পথে এবং তার চরিত্রের মধ্যে বুয়ুর্গানে দ্বীনের সুহবত লাভের গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে নিঃসন্দেহে। যে যার সাথে উঠা বসা করবে সে তার রুহানী তাজীর ও আমলের অনুসরণ করবে। কেন না সঙ্গ লাভে বা সুহবতের দ্বারা মানুষের মধ্যে তাজীর (প্রভাব) সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক যুগের পীর মশায়েখগণ এ বিষয়ে একমত যে, মানবীয় চরিত্র গঠনের মধ্যে সত্যিকার পীর বুয়ুর্গের সুহবতের এবং তার সাথে অবস্থানের যে ভূমিকা রয়েছে, অন্য কোন জিনিসের ভূমিকা ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ নয় এতে কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই। কোরআন, হাদীস, বুয়ুর্গানেদ্বীন এমন কি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এ বিষয়ে একমত। যার জন্য কোন ধরনের দলীল বা প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। সাহাবা-এ-কেরামগণ জাহেলীয়াতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার পর একমাত্র হুজুর পুর নুর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গ ও সংশ্রবের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন সম্মানের উচ্চ আসন ও উচ্চ মর্যাদা। অনুরূপভাবে তাবৈঈনগণও উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সাহাবা-এ-কেরামের সুহবত ও সংশ্রবের মাধ্যমে। অত্র প্রবন্ধে সুহবতের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুটি ঘটনা পেশ করছি।

(এক) কালো হাবশী ক্রীতদাস হয়ে গেল চাঁদের মতো সুন্দর :

বিশ্ব প্রেমিক হযরত মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি মসনবী শরীফে বর্ণনা করেছেন— এক যুদ্ধে সাহাবা-এ-কেরামগণ আরজ করলেন এয়া রাসুলুল্লাহ (স:) ইসলামী সৈন্য দলে পানি মোটেই নেই। হুজুর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেরে খোদা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নির্দেশ দিলেন, ঐ সামনে যে পাহাড় দেখতেছ সেটার পাদদেশে এক কালো হাবশী (ক্রীতদাস) উট বোঝাই পানি নিয়ে যাচ্ছে। তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। নির্দেশ পেতেই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পাহাড়ের পেছনে সেটার পাদদেশে পৌঁছে গেলেন। দেখলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ অনুসারে একটি উটের উপর হাবশী ক্রীতদাস দুটি বড় বড় মশক ভর্তি পানি নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— পানি এখান থেকে কত দূরে? সে বললো, আমি গতকাল এ সময় পানি ভর্তি করে রওনা হয়েছি। আজ এখানে পৌঁছেছি। বললেন পানি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

ক্রীতদাস বললেন, আমি এক ব্যক্তির গোলাম। সে আমাকে পানি সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেছে। আমি আগামীকাল এমনি সময়ে মনিবের ঘরে গিয়ে পৌঁছবো। পানি ওখান থেকে (অর্থাৎ আমার মনিবের ঘর থেকে) দু'দিনের দূরত্বে পাওয়া যায়। শেরে খোদা বললেন, তোমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকছেন। সে বললো, তিনি কে? শেরে খোদা বললেন, আসেন নিজের চোখে দেখে নেন তিনি কে? সে বললো, আমি যাবো না! শেরে খোদা বললেন, তোকে যেতেই হবে। শেষ পর্যন্ত সে জেদ ধরলো। হযরত মাওলা আলী ও রাসুল-এ-করীমের নির্দেশ পালন না করে ছাড়বেন না। তিনি শক্তি প্রয়োগ করে তার উটকে ওই দিকে চালনা করলেন। সে চিৎকার করতে লাগলো, কে আছে! ইনিতো আমার পানি জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যার হাত হযরত আলী শেরে খোদা পাকড়াও করেছেন, তার হাত ছাড়বার সেখানে কে আছে? সে চিৎকার করতে লাগলো, কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) তাকে নবী-ই করীমের (সঃ) পবিত্র দরবারে নিয়েই আসলেন। এখন ওই গোলাম নবী-ই আকরাম হুজুর-ই পুর নুরকে দেখলো, পবিত্র দরবার দেখলো। অমনি সে সব কিছু ভুলে গেল। উট থেকে নেমে এক পাশে থমকে দাঁড়িয়ে রইলো। হতবাক হয়ে গেলো এ ভেবে যে, সেকি ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে, নাকি আসমানে। এ মহান



দরবারে যাঁরা আছেন, তারা কি মানব জাতির কেউ, না কোন পবিত্র জগতের। সরকারে দোজাহানের হুকুম হলো তার মশকগুলো থেকে পানি নিয়ে ব্যবহার করতে থাকো! সাহাবা-ই কেরাম নির্দেশ পাওয়া মাত্র দৌড়ে গিয়ে ক্রীতদাসের মশক দুটি থেকে আপন আপন মশকে পানি ভর্তি করে নিলেন। পিপাসীতরা পানি পান করে তৃপ্ত হলেন, উটগুলোকে পান করালেন। গোটা ইসলামী সৈন্য দলে যথেষ্ট পরিমাণে পানি সরবরাহ হয়ে গেল। কিন্তু ঐ ক্রীতদাসের মশক থেকে এক ফোঁটা পানিও হ্রাস পায়নি। মওলানা রুমী (রহ:) বলেন, ঐদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ক্রীতদাসের) ঐ মশকের সম্পর্ক হাউজে কাউসারের সাথে করে দিয়েছিলেন ওখান থেকে পানি আসছিলো। যখন সবাই পানি নিলেন, তখন হুজুর-ই আকরাম (সঃ) সাহাবা-এ-কেরামের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন, তোমরা তার মশক থেকে পানি নিয়েছো তোমরা তাকে রুটি দাও। তাঁরা আপন আপন তাবু থেকে রুটির টুকরা নিয়ে একত্রিত করলেন আর একটি থলে ভর্তি করে তাকে দিয়ে দিলেন। সুবহান্নালাহ! ওটা কেমন মজার বিনিময় হলো, যাতে সিদ্দীক আকবর ও ফারুক আজম (রা:) এদের প্রদত্ত টুকরোও ছিল! অতপর বল্লেন, ওহে ক্রীতদাস! তুমি আপন মশক দুটি দেখে নাও, এক ফোঁটা পানিও হ্রাস পায়নি, আমরা আমাদের রবের অনুগ্রহ থেকে পানি নিয়েছি। আর তোমাকে এ রুটিগুলো দিচ্ছি! এগুলো নিয়ে চলে যাও। ক্রীতদাস বললো, এখন আমি তো এসব দেখে নিজেকেও হারিয়ে ফেলেছি। যাবো কোথায়? আমাকে আপনারা ডেকে এনে এখন বের করে দিচ্ছেন? আমি তো শুনেছি দাতা আপন দরজায় কাউকে ডেকে এনে বের করে দেন না। আমি এখন এতোই প্রীত ও বিভোর হয়ে গেছি যে, আমি জানিনা আমি কে? আমার এ খবরও নেই যে, আমি কোথায় থাকি এবং কোথেকে এসেছি।

সুতরাং হুজুর-ই-আকরাম (স:) তাকে আপন কম্বল শরীফে ঢেকে নিলেন। জানিনা দাতা কি দিয়েছেন আর এ গ্রহীতা কি নিয়েছে! কিছুক্ষণ পর কম্বল শরীফ থেকে ঐ ক্রীতদাসকে বের করে আনলেন। কী দেখা গেলো? ঐ কালো কুৎসিৎ হাবশী গোলাম চাঁদের মত সুন্দর হয়ে গেলো। কবি শেখ সাদী (রহ:) তার গোলোস্তা কিতাবে ঐ হাবশীর কথাটি নিজের ভাষায় লিখেছেন—

جمال ہمنشین درمن اثر کرد ÷ وگرنہ من چنان خام کہ ہستم

অর্থাৎ, আমার মধ্যে আমি যার সাহচর্যে ছিলাম তাঁর প্রভাব পড়েছে, অন্যথায় আমি তো মাটিই ছিলাম।

অতপর হুজুর-ই-আকরাম (স:) এরশাদ ফরমালেন, এখন তোমাকে আমি পাঠাচ্ছি। যাও! সে বললো আচ্ছা যাচ্ছি! সে উটের উপর চড়ে বসলো এবং রওনা দিলো। ঐদিকে তার মুনিব চিন্তিত হয়ে পড়লো ক্রীতদাসের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? ক্রীতদাসটি এদিক থেকে অবসর হয়ে যখন নিজ শহরে প্রবেশ করলো, তখন তার মুনিব ও মুনিবের লোকজন তাকে তালাশ করতে বের হয়েছিল। মুনিব দূর থেকে দেখলো আর ভাবলো উটতো আমার, মশকও আমার। কিন্তু উটের পিঠে কুৎসিৎ হাবশী ক্রীতদাস তো নয়, একেতো ফর্সা রুমী লোকের মতো দেখাচ্ছে। আর মনে করলো হয়তো সে কোন চোর কিংবা ডাকু হবে। আমার ক্রীতদাসকে হত্যা করে আমার উটটি তার করায়ত্তে নিয়ে নিয়েছে। এটা ভেবে মুনিবের ইঙ্গিতে তার লোকেরা তাকে মারতে উদ্যত হলো। গোলাম আর্ত চিৎকার করে উঠলো, আর বললো আপনারা আমাকে মারছেন কেন? তারা বললো, তুই আসলে কে? আমার ক্রীতদাস যে এ উট ও মশক নিয়ে পানির জন্য গিয়েছিলো সে কোথায়? সে বললো আমিই আপনার ক্রীতদাস। গত পরশু এখান থেকে পানির জন্য গিয়াছিলাম। আপনার সব অবস্থা সম্পর্কে আমাকে বলতে দিন। আপনার পরিবারের সবার নাম জিজ্ঞাসা করুন। সুতরাং সে মুনিবের যাবতীয় অবস্থা ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম ইত্যাদি বললো। তখন মুনিব বললো, তুই তো কথা বার্তা আমার ক্রীতদাসের মতো বলছিস, কিন্তু তোর গায়ের রং ছিলো কালো, ওষ্টয়ুগল নীলার, দাঁত ছিলো বড় বড় নাক ছিলো চেপ্টা। আর এখন তোমার রং যে একেবারে ফর্সা, নাক পাতলা, দাঁতও ছোট ছোট! আর ওষ্টয়ুগল অতি সুন্দর। তুমি রুমী, আর সে ছিলো হাবশী। এর কারণ কি? ক্রীতদাস বললো, কথা হচ্ছে আমি ছিলাম তো হাবশী, কিন্তু যখন পানি নিয়ে আসছিলাম, তখন পথে শামশুদোহা, বদরুদ্দোজা, সাইয়্যেদুল আযিয়া সাল্লাল্লাহু



তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাওহীদ ও রহমতের ঐ সমুদ্র ছিল তাঁর মহান দরবার। তাতে ডুব দিয়ে কেউ হয়েছেন সিদ্দীক, কেউ হয়েছেন ফারুক আজম, কেউ হয়েছেন গণি, কেউ হয়েছেন শেরে খোদা, আমাকেও তিনি ঐ সমুদ্রে চুবিয়ে তুলেছেন- আমার হৃদয়ের রং হয়ে গেছে একেবারে ফর্সা (নুরানী), আর আমার দেহের রংও হয়ে গেছে একেবারে আগেকার বিপরীত। সুবহানাল্লাহ! হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছুক্ষন সুহবতের প্রভাবে ক্রীতদাসের মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন আসলো। সে ছিল একজন কালো কুৎসিৎ ও অবহেলিত ক্রীতদাস। আর নবী-ই-পাকের (সঃ) ঐ এ কটি মাত্র সাক্ষাতের ফলে সেই হলো মু'মিন থেকে সাহাবী এবং যাহের ও বাতেনে হলো অপূর্ব সুন্দর ও উভয় জাহানে সৌভাগ্যবান। এ ঘটনা থেকে আউলিয়া-এ-কামেলীনগণের সুহবত বা সাহচার্যের মর্যাদা অনুমান করা যায়। যেহেতু হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালত কেয়ামত পর্যন্ত নির্ধারিত, সেহেতু তাঁরই ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হিসেবে পরবর্তীকালে আউলিয়া-এ-কামেলীনগণ লোকদেরকে হেদায়ত ও আল্লাহ তা'আলার দিকে আহবানের দায়িত্বে নিয়োজিত। এ কারণেই যারা তাদের সংশ্রব লাভ করবে নূরে নবুওয়তের আলো তাদের দিকে সম্প্রসারিত হতে থাকবে। তাই যারা তাঁদের সাহায্য করবে তারা স্বয়ং আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করবে এবং যে ব্যক্তি স্বীয় রজ্জু (সম্পর্কের রশি) তাঁদের রজ্জুর সাথে সংযুক্ত করবে (অর্থাৎ আল্লাহর অলীগণের প্রতি ভক্তি মহব্বত রাখবে) তার দ্বারা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব ওয়ারিশের দ্বারা মানুষের মধ্যে সহীহ দ্বীন প্রচলিত থাকবে। গাউছুল আজম বিল বেরাছত, কুতুবুল আকতাব ইউচুপে সানী, ঝালওয়ায়ে নূরে মুহাম্মদী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান প্রকাশ হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) ঐর সুহবতে ম্যানেজার খলিল হয়ে গেলেন হযরত মওলানা শাহ ছুফী খলিলুর রহমান বি.এ. ছাহেব প্রকাশ হযরত খলিল শাহ রাহমাতুল্লাহে আলায়হি। ইউচুপে সানী শেখে ফা'য়াল গাউছুল আজম বিল বেরাছত হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) ঐর সুহবত লাভ করে যেসব লোক বেলায়তের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে পাঁচলাইশ থানার অন্তর্গত কুলগাঁও নিবাসী হযরত খলিলুর রহমান শাহ বি.এ. (রহঃ) ঐর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

তাঁর জীবনী গ্রন্থ থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি যখন বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বার্মায় মেগলাল মেকেঞ্জী কোম্পানীর ম্যানেজার পদে চাকুরীরত ছিলেন, তখন একদিন চাকুরীতে পদউন্নতির জন্য মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গিয়ে হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) ঐর সমীপে দোয়ার জন্য দরখাস্ত পেশ করেন। হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর হাতে একটি চাপা কলা দিয়ে ছোলাসহ খেয়ে ফেলার নির্দেশ দেন, হযরত মওলানা শাহ ছুফী খলিলুর রহমান বি.এ. প্রকাশ খলিল শাহ (রহঃ) কলাটি আদব সহকারে ছোলাসহ খেয়ে ফেলেন। এরপর থেকে তাঁর জীবনে নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। তিনি আর অফিসে যান না, চাকুরী করেন না, সংসারের দিকেও দ্রষ্কেপ নেই। হযরত বাবা ভাণ্ডারীর নয়ন বানে আবদ্ধ হয়ে আধ্যাত্মিক জগতের লিলা খেলায় মত্ত হয়ে যান। কবির ভাষায়-

آنکھوں آنکھوں میں اشارہ ہو گئے ÷ تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے

অর্থাৎ, চোখে চোখে ইশারায় কথা হয়ে গেছে তুমি আমার হয়ে গেছো, আমি তোমার হয়ে গেছি।

হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এঁর ওয়ারিশ পীর মুর্শীদগণের সঙ্গ লাভের দ্বারা পরশ পাথরের ন্যায় ঈমানী ও রুহানী ফায়দা লাভ হবে, ইহা পরিস্ফীত। তাঁদের থেকে দূরে থাকা ঈমান ও রুহের জন্য বিষ পান করার তুল্য। তাঁদের সংশ্রব আল্লাহর পথে চলার এবং চরিত্রের পরিশুদ্ধি ও নফসের সংশোধনের জন্য জরুরী। ইহাই হচ্ছে অতি ক্রিয়াশীল ও কার্যকরী চিকিৎসা, সর্বোপরি ইহা হচ্ছে ঈমানের ভিত্তি মজবুতকারী। কেননা এসব মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ কিতাব অধ্যয়ন ও বই পুস্তক পাঠ করার মাধ্যমে পাওয়া যায় না।



তথ্য সূত্র :

- ১। এলমে তাছাউফের হাকীকত
- ২। আল-ইহসান বা তরীকত তত্ত্ব
- ৩। মাসিক তরজুমান ২০১০ সংখ্যা
- ৪। তাছাউফের আসল রূপ
- ৫। বাগে খলিল (২য় খণ্ড)।

সভাপতি : গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

“তুমি শানে রসুল, শানে গাউছুল, শানে দেলাওর।
খোদার রঙ্গে এমদাদ মওলা মুর্শিদ আমার।।”

২২ চৈত্র পবিত্র ওরশ শরীফ
উপলক্ষে প্রকাশিত ‘জ্ঞানের আলো’র
সফলতা কামনা করছি।

আমার, আমার পরিবারের ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট
সকলের জন্য দো‘জাহানের সর্বঙ্গীন কল্যাণ কামনায়-
শ্রদ্ধাবনত-

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী
(শাহ্ এমদাদীয়া)। চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ।

“চল গো প্রেম সাধুগণ-প্রেমেরী বাজার।
প্রেম হাট বসাইয়াছে-মাইজভাণ্ডার মাজার।।”

ভাণ্ডারী ট্রেডার্স

ডিলার : রশিদ ওয়েল মিলস (হোয়াইট গোল্ড)

রশিদ এথোফুড

মুহাম্মদ ইউনুচ মিয়া
প্রোপ্রাইটর

(রাউজান রাস্তানিয়া, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি)

গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-৯০৯৫২১



বিশ্ব খ্যাত সুফি সাধক হযরত ওয়ায়েসুল করণীর (রঃ) মালফুজাত : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

রাসুল প্রেমের মূর্ত প্রতীক হিসেবে যদি কারো নাম লিখতে হয় তাহলে সর্বাত্মে যাঁর নাম উঠে আসে তিনি হলেন হযরত ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) এঁর নামে পাক। যিনি শয়নে স্বপনে সব সময় ছিলেন রসুল প্রেমে দিওয়ানা। যার সম্পর্কে প্রিয় নবী (স:) সাহাবায়ে কেরামকে এরশাদ করেছিলেন, করণ শহরে ওয়ায়েস নামি আল্লাহর এক বান্দা আছেন যার শাফায়াতে হাশরের ময়দানে রবিয়া ও মজর গোত্রীয় ছাগ পালের পশমের চেয়ে বেশী আমার প্রিয় উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এরপর প্রিয় আকাঁ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফারুককে আজম (রঃ) এবং হযরত আলি মরতুজা (রঃ) কে নির্দেশনা দিয়ে এরশাদ করেছেন তোমরা তোমাদের হায়াতে জিন্দেগানীতে ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) সাথে অবশ্যই স্বাক্ষাত করবে এবং তার কাছে আমার সালাম পৌছাবে এবং আমার গুনাহগার উম্মতের জন্য দোয়া করার অনুরোধ জানাবে। ১

যাঁর কাছে প্রিয় নবী (স:) স্বয়ং সালাম পাঠালেন, উম্মতের জন্য দোয়া চাইলেন কিভাবে অর্জিত হলো হযরতের এই মকাম মূলত: আল্লাহর বন্দেগী, প্রিয় নবীর প্রতি বেমেছাল ভালবাসা, পাশাপাশি সাতটি বিশেষ গুণাবলী নিজের জীবনে এখতেয়ার করতেন এবং হযরতের ভক্ত-অনুরক্ত রসুল প্রেমিকদের অনুশ্রমণ করার নসিহত করতেন। এই পর্যায়ে আমরা সেই সাতটি নসিহত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করব।

* বিনয় :

তিনি নিজেই বিনয়ী ছিলেন এবং সকলকে বিনয়ী হবার জন্য নসিহত করতেন। হযরত খাজা ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) সব সময় বলতেন রুহানী ভাবে আমি যা কিছু অর্জন করেছি সব কিছুর মূলে ছিল বিনয়, পৃথিবী খ্যাত আশেকে রসুল হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সব সময় আদনা মনে করতেন এবং পৃথিবীর সকল মানুষকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করতেন। মূলত: বিনয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুলতানুল আরেফিন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) সে কথাই পরিস্ফুটিত করেছিলেন, তিনি বলেছেন-বিনয়ী ব্যক্তি কখনো নিজের কোন মকাম বা অবস্থানের কথা কল্পনা করেন না। বরং গোটা সৃষ্টি জগতকেই নিজের চেয়ে উত্তম ভাবে থাকেন। সুলতানুল আরেফীন বিনয়ের কিছু আলামত ও ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

(ক) যিনি খাদেম, চাকর-বাকরদের সাথে এক সাথে খাবার-দাবার গ্রহণ করেন।

(খ) বিনয়ী ব্যক্তি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস যেমন ইট, পাথর ইত্যাদি সরিয়ে দেন।

(গ) তিনি ছোট-ছোট শিশু-কিশোরদের সব সময় প্রথমে সালাম করেন।

(ঘ) যিনি সব সময় গরীব, ফকীর-মিসকিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন।

(ঙ) বিনয়ী ব্যক্তি সবসময় নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করেন এমন কি গরু-ছাগলসহ গৃহপালিত পশু লালন পালন করতে পছন্দ করেন।

(চ) ঘরের প্রয়োজনীয় বাজার সদায় নিজেই কেনা-কাটা করেন।



(ছ) নিজের পিছে পিছে মানুষজন হাটুক সেটা পছন্দ করেন না। ২

গাউছুল আজম শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বলেন, বিনয়ী ব্যক্তির মরতবা আল্লাহ নিজেই বাড়িয়ে দেন এবং বেহেস্তে তার জন্য একটি মহল তৈরী করেন। হযরত আরো বলেন, বিনয় এমন একটি ভাল গুণ যা মানুষকে ছালেহীন বান্দাদের সাথে মিলিয়ে দেন এবং তিনিও তাদের সাথে আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়ে যান। গাউসে পাক আরো বলেন, বিনয় হলো মানুষ অপরের সামনে নিজেকে আদনা মনে করবে। বিনয়ী ব্যক্তি অপরের ব্যাপারে এমন ধারণা রাখবে, তিনি আল্লাহর কাছে আমার চেয়ে বেশী মকবুল। যিনি বয়সে ছোট তাঁর ব্যাপারে ধারণা রাখতে হবে বয়স কম হবার কারণে নিশ্চয় আমার চেয়ে উনার গুনাহ কম। আর যিনি বয়সে বড় সম্মানের সাথে উনার ব্যাপারে ধারণা পোষণ করতে হবে বেশী হায়াতের কারণে উনার নেক আমল আমার চেয়ে অনেকগুন বেশী। একজন আলেমের ব্যাপারে সাধারণের ধারণা এমনটি হওয়া চাই তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। আর কোন জাহেল কোন গুনাহ করলেও তার ব্যাপারে ধারণা রাখতে হবে তিনি তা অজ্ঞতা বশতঃ করেছেন। আর কোন মানুষ যদি অমুসলিম হন তার ব্যাপারেও ভাল ধারণা পোষণ করার তাগাদা দিয়েছেন। কেননা পরিণত বয়সে তিনি ইসলাম কবুল করে ভাল মুসলমানে রূপান্তর হতে পারেন। তাই হযরত খাজা ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহর নেকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হিসেবে দুনিয়াতে উচ্চ মরতবা এবং পরকালে মুক্তির আশা পোষণ করেন তিনি যেন নিজের জন্য সব সময় বিনয় এখতিয়ার করেন। ৩

* সৃষ্টির শুভ কামনা :

হযরত খাজা ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) তার দ্বিতীয় কালামে এরশাদ করেছেন, কেউ যদি পরকালে তার উচ্চ মর্যাদা আশা করেন তার ব্যাপারে আমার ওসিয়ত থাকবে সে যেন আল্লাহর অপর সৃষ্টির ব্যাপারে সব সময় শুভ কামনা করেন। যিনি সৃষ্টির হিতাকাঙ্ক্ষী তিনি সব সময় আল্লাহর দরবারে মকবুল। কিভাবে একজন মানুষ সৃষ্টির শুভ কামনা করতে পারেন তার ব্যাখ্যায় গাউছুল আজম হযরত শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বলেন, কোন মুসলমান ভাইকে কোন জায়গায় নিন্দনীয় কোন শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপন না করা। অথবা কোন মুসলমান ভাইকে ছোট করার মানষে তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা না করা। কারো বিরুদ্ধে ছোগলখোরী করা ইত্যাদি খারাপ গুণাবলী কোন মানুষের শুভ কামনার অন্তরায়। এই সমস্ত খাছলত সৃষ্টির শুভ কামনার অন্তরায় এবং পরহেজগার লোকদের জন্য আত্মঘাতী। এই জন্যই বিশ্ব বিখ্যাত আশেকে রাসুল খাজা ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) বলেছেন, যিনি আখিরাতে মুক্তি চান তিনি যেন আল্লাহর বান্দাদেরকে ভালবাসেন এবং সব সময় তাদের শুভ কামনা করেন। ৪

* মানবতা :

হযরত ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) এর তৃতীয় কালাম হলো মানবতাবোধ। তিনি সব সময় মানুষের প্রতি মানবিক আচরণ করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। কেউ কাউকে কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করলে তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাকে কিছু দান করা, কোন মানুষ অন্য কাউকে কোন বিষয়ে কষ্ট দিলে তার বদলা না নিয়ে তার প্রতি এহসানের হাত বাড়িয়ে দেয়া। গরীব দুঃখী মেহনতি মানুষের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। রাসুলে পাক (সঃ) হাদীসে পাকে এরশাদ করেছেন, কেউ জমীন বাসীর প্রতি এহসান করলে আসমান ওয়ালা খোদা তার প্রতি এহসানের হাত বাড়িয়ে দেন। মানবতার কাগুরী নবী করিম (সঃ) টাকা-পয়সা ধন-সম্পদ নিজের কাছে যা কিছু থাকত তা সঞ্চয় না করে অপেক্ষাকৃত গরীব সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দিতেন। আর দরিদ্র হালতে জীবন-যাপন করতেন আর বলতেন এই দারিদ্রতা আমার জন্য গৌরবের।

হযরত খাজা ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) বলতেন- যিনি হাজারো প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করে গরীবী হালতে জিন্দেগী অতিবাহিত করতে পারেন তিনিই প্রকৃত ফকীর, তিনিই প্রকৃত দরবেশ। আর যে ব্যক্তি পরকালে অনাবিল শান্তি চান



তার উচিৎ দরবেশী-জিন্দগী এখতিয়ার করা।

*** তাকওয়া বা পরহেজগারী :**

মানুষ দুনিয়াতে কোন নিসবত কয়েম করার জন্য মানুষের বংশ মর্যাদা তালাশী করে। হযরত খাজা ওয়ায়েস করণী বলেন, যার জীবন তাকওয়া তথা খোদভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তার চেয়ে উচ্চ বংশীয় আর কোন বংশ মর্যাদার লোক পৃথিবীর জমীনে হতে পারেনা। কারণ এই একটি নিসবত ছাড়া দুনিয়াবী কোন বংশ মর্যাদার লোক পরকালে মুক্তি পাবেনা। যেমনটি আল্লাহ কোরানে বলেছেন- “ইন্না আক্রামাকুম ইন্দাল্লাহি আতক্বা কুম। নিশ্চয়, আল্লাহর কাছে তিনিই সম্মানী যিনি অধিকতর মুত্তাকি। মূলতঃ পরকালে মা-বাপ, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন তথা সর্বস্তরের মানুষের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শুধু একটি সম্পর্ক অটুট থাকবে আর তা হলো তাকওয়া তথা পরহেজগারীর সম্পর্ক। এই তাকওয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুহাম্মদ বিন সালামান (রঃ) বলেন, আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছু পরিত্যাগ করার নাম হলো তাকওয়া। হযরত জাফর (রঃ) বলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা না করার নাম হলো তাকওয়া। ইমাম কুশাইরী বলেন, আম জনসাধারণের তাকওয়া হলো গুনাহ থেকে বেচে থাকা আর খাছ লোকদের তাকওয়া হলো আল্লাহ ছাড়া আর সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

*** অল্পে সন্তুষ্ট থাকা :**

হযরত ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) বলেন- কেউ যদি আল্লাহর কাছে বুজুর্গী ও আজমত চায় সে যেন সব সময় অল্পে সন্তুষ্ট থাকেন। আহলে দিল তথা তাসউফ পন্থীদের কাছে অল্পে তুষ্ট থাকা হলো নিজের ভাগ্য লিপির উপর সম্পূর্ণ শোকারঙজার বান্দা হওয়া।

আবার অনেক আহলে মা'রেফতের দৃষ্টিতে “অল্পে তুষ্ট” থাকার অর্থ হলো যে কোন চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে কারো কাছে হাত সম্প্রসারিত না করা। বরঞ্চ যতটুকুন সম্ভব নিজের কাছে যা আছে তা থেকে কিছু অপরকে দান করার ব্যাপারে কৃপনতা না করা। পবিত্র হাদীসে পাকে আছে- আল কিনায়াতু কুনজুন অর্থাৎ অল্পে সন্তুষ্ট থাকা এমন একটি খনি যা কখনো নিঃশেষ হয় না। যিনি অল্পে তুষ্ট থাকতে অভ্যস্থ হন তিনি সৃষ্টি জাহানের কাছে মকবুল বুজুর্গে রূপান্তর হন। ৫

তাজুল আসফিয়া খাজা ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) বলেন, কেউ যদি পরকালে উচ্চ মরতবা পাবার আশা পোষণ করেন তিনি যেন অল্পে তুষ্ট থাকেন এবং আল্লাহ যা দিয়েছেন তার উপর সবার এখতিয়ার করেন। সম্পদ জমাকারী ব্যক্তি সব সময় জিল্ল্যতির গর্তে নিপাতিত হন।

মওলানা মুহাম্মদ বিন শেখ মুহাম্মদ জালি (রঃ) স্বীয় কিতাব “রিয়াদুন নাছিহীন” এ একটি ঘটনা নকল করেছেন। আর তা হলো বিশ্ব বিখ্যাত সুফী-সাধক শেখ শিবলী (রঃ) একদিন এক মাদ্রাসার পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিলেন। তিনি দুই মাদ্রাসা ছাত্রকে দেখলেন তাদের মধ্যে একজন ছিল আমির জাদা অপরজন ছিল ফকির জাদা। যিনি আমির জাদা নাস্তা করার জন্য তিনি নিলেন ঘি দিয়ে ভাজা রুটি এবং মধু। আর যিনি ফকির জাদা তিনি নিলেন শুধু শুকনো রুটি। এ অবস্থায় ফকির জাদার অন্তরে মধু খাবার খায়েশ জাগলে তিনি আমিরের ছেলের কাছে মধু চাইলেন। আমিরের ছেলে বললেন তোমাকে যদি মধু পেতে হয় তাহলে আমার পিছনে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে ঘুরে বেড়াতে হবে। ফকির জাদা দীর্ঘ সময় ঘেউ ঘেউ করে আমির জাদার পিছনে ঘুরে বেড়ানোর পরে আমির জাদা বললেন আমার কাছে কুকুরের খাওয়ার উপযোগী কোন মধু নেই সুতরাং, আমি তোমাকে মধু দিতে পারলাম না। শেখ শিবলী বলেন, আমি তখনি নিজেকে নিজে বললাম, ফকির জাদা যদি আজ অল্পে তুষ্ট থাকতেন, অপরের খাবারের প্রতি লোভ না করতেন, তাহলে তাকে পশুর আচরণ গ্রহণ করে জনসমক্ষে বেইজ্জত হতে হতোনা। ৬



* দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি :

খাজা ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) বলেন- যখন আমি আখিরাতে শান্তি পাবার কথা চিন্তা করতাম তখন আমি বুঝতে পারতাম এই প্রশান্তি দুনিয়া বিমুখতার মধ্যে রয়েছে। হযরত আবু সালমান (রঃ), দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির ব্যাপারে সওয়াল করা হলে তিনি বলেন, যে জিনিস মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে তা বর্জন করে দেয়াই হলো অনাসক্তি। হযরত খাজা হাসান বসরী (রঃ) বলেন, আহলে দুনিয়া তথা দুনিয়াবাজদের প্রত্যাখান করাই হলো দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি।

শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বলেন, একজন ঈমানদারের জন্য পরকালে আল্লাহর দিদার প্রাপ্তির মত আর কোন জিনিস অন্তরে প্রশান্তি আনবে না। দুনিয়া ঈমানদারের জন্য জেলখানা আর কাফেরদের জন্য জান্নাত, দুনিয়ার যাবতীয় আরাম-আয়েশ বর্জন করার মধ্যে মূলত: পরকালীন প্রশান্তি নিহিত রয়েছে। ৭

* সংযমশীলতা :

একজন মানুষ যখন সংযমের মাধ্যমে নিজের খায়েশাতে নফসানীকে কাবু করে দুনিয়া এবং দুনিয়াস্থ সকল বিষয়ের মৃত্যু ঘটান, তখন একজন সুফি পূর্ণ কামিয়াবী অর্জন করেন। মওলানা শেখ মাহমুদ শায়খানী কাদেরী বলেন, দুনিয়ায় মৃত্যু ঘটানোর মতলব হলো আল্লাহর তামাম সৃষ্টিকে নিজের দুশমন মনে করে দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। একজন মানুষ যখন নিজেকে এ পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন তখন তিনি আল্লাহর খালেছ বান্দা হয়ে যান। ৮

বিশ্বখ্যাত আশেকে রসুল খাজা ওয়ায়েসুল করণী (রঃ) বলেন- যারা আমার এই সাতটি নসিহত জীবনে বাস্তবায়িত করবে তারা পরকালে পাবে অনাবিল প্রশান্তি। আল্লাহ আমাদের সকলকে আলোচ্য মালফুজাত জীবনে বাস্তবায়িত করে এক একজনকে হযরতের ন্যায় আশেকে রসুল বনার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র :

- ১। কাশফুল মাহজুব-দাতাগঞ্জ বক্স আলী হাজাবিয়ী (রঃ)
- ২। মাকসুদ তওয়ালেবীন/শরায়াতুল ইসলাম
- ৩। ফতহুল গায়ব-শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)
- ৪। প্রাগুক্ত
- ৫। রিসালায়ে উলইয়া ফি আহাদিসিন নবুবিয়্যাহ
- ৬। রিয়াদুন নাসিহীন-শেখ মুহাম্মদ বিন জালি (রঃ)
- ৭। প্রাগুক্ত-শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)
- ৮। কিতাবে হামাতুস যাকেরীন-সৈয়দ মাহমুদ শায়খানী কাদেরী

প্রভাষক : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আশেকানে আউলিয়া (ডিগ্রী) কলেজ, শহীদনগর, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।

খতিব, বায়তুছ ছাফা জামে মসজিদ, রোড-২০, সিডিএ আ/এ, আত্মবাদ, চট্টগ্রাম।



হযরত কিবলা, হুজুর কিবলা বলা প্রসঙ্গে

সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুর রউফ

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি যিনি অতি দয়ালু ও অতি মেহেরবান। সমস্ত প্রশংসা স্রষ্টার প্রতি এবং শত কোটি দরুদ ও সালাম উভয় জাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর প্রতি। শতশত সালাম সাহাবী, তাবেরী, আউলিয়া ইকরামদের প্রতি।

আমাদের দেশে বর্তমানে আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে নবী, ওলী, পীর মাশায়েখদের শানে কিবলা শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে, তাহা নিয়ে অনেক বাতেল ফেরকা বিভিন্ন ধরনের আলোচনা, এমন কি আমাদের ছুন্নীদেরও অনেকে বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি করতে শুনা যায়। এজন্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে এই মাসআলাটির সমাধান কি তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

আমাদের প্রথমে জানতে হবে কিবলা শব্দটি আরবী (قِبْلَةٌ)। এটা নাম বাচক ইহা جِهَةٌ ও طَرَفٌ দিক বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- প্রখ্যাত মুফাচ্ছির আল্লামা নাছির উদ্দীন বায়যাবী (রঃ) বলেন,

(وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا)

অর্থাৎ আপনি যে কিবলার উপর ছিলেন এজন্যেই কিবলা করেছিলাম। এর তাফহীরে বলেন,

أَيَّ الْجِهَةِ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَهِيَ الْكَعْبَةُ অর্থাৎ- ঐদিকে যে দিকে আপনি ছিলেন আর তাহা হল- “কাবা”।

আল্লামা জালাল উদ্দিন ছুয়ুতী (রঃ) উক্ত আয়াতের তাফহীরে, তাফহীরে জালালাইন শরীফে, তাফহীরে ছাবীতে

الْقِبْلَةُ শব্দের অর্থ (الْجِهَةُ) দিক অর্থ বলেছেন।

আল্লামা মাহমুদ আলুছী আল বাগদাদী (রহঃ) তাফহীরে রুহুল মায়ানীতে الْقِبْلَةُ শব্দের অর্থ (الْجِهَةُ) দিক অর্থ নিয়েছেন।

তাছাড়া الْقِبْلَةُ কিবলার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বনামধন্য মুফাচ্ছিরে কুরআন আল্লামা নাছির উদ্দীন বায়যাবী

(রঃ) বলেন- الْقِبْلَةُ فِي الْأَصْلِ الْحَالِ الَّتِي عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ مِنَ الْإِسْتِقْبَالِ فَصَارَتْ عُرْفًا لِلْمَكَانِ الْمَتَوَجَّهِ نَحْوَهُ لِلصَّلَاةِ - (تفسير بياضى، سورة البقرة: ১৪১)

অর্থাৎ- প্রকৃত পক্ষে কিবলা বলা হয় এমন অবস্থা যে অবস্থাকে ইনসান (মানুষ) তার সামনে রাখে। অপর কিবলা শব্দটি প্রচলিত অর্থে এমন স্থানের অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, নামাযের জন্য যেদিকে ফিরা হয়। তাফহীরে বায়যাবী, ছুরা বাকারাহ আয়াত নং- ১৪৩



বিশ্ব বিখ্যাত মুফাচ্ছির মাহমুদ আলুছী আল বাগদাদী (রঃ) বলেন,

أَصْلُهَا الْحَالَةُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا الْمُقَابِلُ إِلَّا أَنَّهَا فِي الْعُرْفِ الْعَامِ اسْمٌ
لِلْمَكَانِ الْمُقَابِلِ الْمُتَوَجَّهِ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ .

অর্থাৎ কিবলার আসল অর্থ হল, এমন অবস্থা যা সামনে থাকে। তবে সাধারণ পরিভাষায় এমন স্থানকে কিবলা বলা হয়, নামাজে যার প্রতি মূখ ফিরানো হয়। (তাফছীরে রুহুল মায়ানী ২য় খণ্ড ২য় পৃঃ) সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমানিত হয় মানুষ যাকে সামনে নেয়, সামনে রাখে; সামনে করে, যার দিকে হয় তাকে কিবলা বলা হয়। তবে নামাজের জন্য কিবলা হল পবিত্র কাবাঘর। যেহেতু নামাজে কাবা ঘরকে সামনে নেওয়া ফরজ।

কিবলার সংখ্যা : কিবলা কয়টি, এই প্রশ্নের উত্তরে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ
جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

অর্থাৎ- প্রত্যেকের জন্য কিবলা রয়েছে একেক দিকে। যে দিকে সে মুখ করে এবাদত করবে। অতপর সকলেই সংকাজে প্রতিযোগিতা মূলকভাবে এগিয়ে যাও। তোমরা যেখানেই থাকবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (ছুরা বাকারাহ ১৪৮ নং আয়াত)

উক্ত আয়াতে **وَجْهَةٌ** শব্দের অর্থ হল **قِبْلَةٌ** তাফছীরে জালালাইন, তাফছীরে বায়যাবী, তাফছীরে শেখ জাদা, তাফছীরে রুহুল মায়ানী, তাফছীরে রুহুল বায়ান, তাফছীরে সাফাওয়াতুত তাফাছীর ও তাফছীরে ছাবী ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাচ্ছির আল্লামা মাহমুদ আলুছী আল বাগদাদী (রঃ) বলেন-

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا أَنْ لِكُلِّ أَحَدٍ قِبْلَةٌ فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشِ .
وَالرُّوحَانِيِّينَ الْكَرْسِيِّ وَالْكَرُوبِينَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ . وَالْأَنْبِيَاءِ قِبْلَكَ
بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَقِبْلَتَكَ الْكَعْبَةَ ، وَهِيَ قِبْلَةُ جَسَدِكَ ، وَأَمَّا قِبْلَةُ
رُوحِكَ فَأَنَا ، وَقِبْلَتِي أَنْتَ . (تفسير روح المعاني، ص ١٥)

অর্থাৎ- প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কিবলা আছে আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, নিশ্চয় প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা কিবলা রয়েছে। যেমন- আল্লাহর নিকটতম বান্দাদের জন্য কিবলা হল আরশ; অধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের কিবলা হল-কুরছি, মুছিবতগ্রস্থ ব্যক্তিদের কিবলা হল বায়তুল মা-মুর, হে রাহুল (স:) আপনার পূর্বের নবীদের কিবলা হল-বায়তুল মোকাদ্দাছ। আপনার কিবলা হল, “কাবা ঘর”। তবে ওটা হল আপনার দেহের কিবলা, আপনার রুহ তথা আত্মার কিবলা হলাম আমি (আল্লাহ নিজেই)। আর আমার (আল্লাহর) কিবলা হলেন, আপনি (আল্লাহর রাহুল



(س:)۔ تافحیہ رھل مانی ۲۳ ۱۵ ۲: ماکتاباے ایمدادیا، مولتان، پاکستان۔

تاھاڈا اڈا آیاآتہر تافحیہر اڈاآتہر مفاآھیرہ کورآن آلاما فخرآدین (ر۴) آلاما آلال اڈین رومی (ر۴) اڈر کبیتار ورننا کورن ے، کون وستر کبلا کی؟

(۱) قبلہ شاہاں بود تاج و کمر قبلہ ارباب دنیا سیم و زر

(۲) قبلہ صورت پرستاں آب و گل قبلہ معن شفاھاں جان و دل

(۳) قبلہ زہاد محراب قبول قبلہ بدکیرتاں کار فضول

(۴) قبلہ تن پر دراں خواب و خورش قبلہ انسان یدانش پرورش

(۵) قبلہ عاشق وصال بے زوال قبلہ عارف جمال ذی الحلال

(۶) قبلہ اصحاب مقصب مال و جاہ قبلہ اہل سلوک اسباب راہ

(۷) قبلہ حرص و اہل باشد ہوا قبلہ قانع توکل بر خدا

اڈا۴ (۱) راجا-بادشاہدہر کبلا ہل- ماآار ماکوٹ، مڈام پشا، دنیاباآدہر کبلا ہل-سورف-رہوپا۔

(۲) مڈرٹ پڈجاریدہر کبلا ہل، پانی و ماٹ، سناآکاریدہر کبلا ہل- من، اڈتر۔

۳۔ آاہہدگنہر (دنیابا ویڈیہدہر) کبلا ہل مسآیدہر مہراو کبول کرا، وڈ-اڈیاسیدہر کبلا ہل-انارآک کآ کرا۔

۴۔ دہہر کبلا ہل- نڈرا و آبار نیے مڈ آکا۔ آہنہ راآ مانوہہر کبلا ہل- لالن-پالان کرا۔

۵۔ آرمیکہر کبلا ہل- مآبوڈ وڈن، آرہفگنہر آا آاڈا آرمیکدہر کبلا ہل- مہان آلاآر سہندار ڈارن۔

۶۔ مرڈاڈانہر کبلا ہل- مال و اڈآت، پآیکدہر کبلا ہل- “پاآہا”۔

۷۔ لہڈی و آکاآآتہر وڈآیدہر کبلا ہل- “آاہدا”۔ پاریڈڈ وڈآیدہر کبلا ہل- آاڈار اڈر ڈرسا کرا۔ تافحیہر آسائنی، تافحیہر کادہری ۱م آو ۳۴، ۳۵ ۲: ڈرڈا۔

آلاما فخر آدین (ر۴) اڈر پرہ ولہہن-

صاآ آآاق نے مرماہے کہ انسان کی ہر ایک آیز کا ایک قبلہ ہے کہ وہ آیز اس قبلہ کی طرف آوآہر آہتی ہے بدن کا قبلہ کھانے پینے سننے و ڈیکھنے و غیرہ کی آیزیں پس جسے آواس آمسہ لڈت پاتے ہیں اور آفس کا قبلہ دنیائے آذا اور زینت متاع نا پاآدار ہے دل کا قبلہ آرت ہے- روء کا قبلہ قرب و ذوق و شوق مآبت ہے، قبلہ سر آوآہر اور معرفت ربانی ہے اور کشف آآاق اور اطلاع معانی اور کشف اسرار میں لکھا ہے کہ ہر آفس ایک ایک طرف متوآہ ہے-



হাকাইক নামক কিতাবের লেখক বলেন- মানুষের প্রত্যেক বস্তুর এক একটি কিবলা আছে- ঐ বস্তু ঐ কিবলার প্রতি ফিরে থাকে। দেহের কিবলা পানাহার, দেখা-শুনা ইত্যাদি যেগুলো দ্বারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বাদ উপভোগ করে, “নফ্‌ছের” কিবলা দুনিয়াবী খাদ্য ও সৌন্দর্য, অন্তরের কিবলা আখিরাত। আত্মার কিবলা নৈকট্য অর্জন, স্বাদ গ্রহণ ও ভালবাসা স্থাপন করা। গোপনীয়তার কিবলা হয় “তাওহীদ ও মারফতে রব্বানী”। “কাশফে হাকাইক” “ইতলায়ে মায়ানী ও “কাশফে আছরার” নামক কিতাবে লেখা আছে যে, প্রত্যেকেই এক এক দিকে ধাবিত আছে।

নবী, অলী, পীর, বুজুর্গ ও আলেমদেরকে কিবলা বলা যাবে কিনা :

এই বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি কুরআন হাদীসের বাণী উপস্থাপন করা আবশ্যিক।

(১) আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থ- হে আল্লাহ আমাদের হিরাতে মুস্তাকিমের (সোজা পথের) উপর পরিচালিত করুন, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন (ছুরা ফাতেহা)

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. (২)

আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে সিদ্দিকিনদেরকে শহীদগণকে ও আউলিয়া ইকরামদেরকে নেয়ামত দান করেছেন।

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. (৩)

নিশ্চয় এ পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক বানিয়ে দেন। (ছুরা আরাফ ১২৮নং আয়াত)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. (৪)

নিশ্চয় আমি উপদেশের পর যাবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাগণ পৃথিবীর মালিক হবেন। (ছুরা আশিয়া ১০৫ নং আয়াত)

পবিত্র হাদীস শরীফ :

১। أَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. ওলামাগণ হলেন নবীগণের উত্তরসূরী।

২। يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْعُلَمَاءِ. কিয়ামতের মাঠে তিন ধরনের ব্যক্তিগণ আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন, ১। নবীগণ ২। শহীদগণ ও ৩। আলেমগণ।

৩। كَمَوْتُ الْعَالِمِ مَوْتُ الْعَالِمِ. আলেমগণ মৃত্যুবরণ করা মানে জগত মৃত্যু বরণ করা।

সুতরাং কুরআন, হাদীসের আলোকে বলা যায় এই সমগ্র বিশ্ব জগত নবী, অলী, পীর, মাশায়েখ ও আলেমগণের প্রতি মুহতাজ, মুখাপেক্ষী। তাছাড়া উম্মতগণ নবীগণের অনুসরণ করেন, মুরীদগণ পীরের অনুসরণ করে, ছাত্রগণ তাদের



শিক্ষকের অনুসরণ করেন এবং গাউছ, কুতুব, অলীগণের অনুসরণ সমস্ত জগতই করে। কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন **أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**۔ সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর আউলিয়াদের জন্য ইহকাল ও পরকালে কোন ধরনের ভয়-ভীতি পেরেশানী নেই।

সুতরাং নবীগণ উম্মতের কিবলা, পীর হলেন মুরিদের কিবলা, শিক্ষক ছাত্রের কিবলা, আউলিয়া, গাউছ, কুতুব সমগ্র বিশ্ব জগতের কিবলা। তবে নামাযের কিবলা শুধুমাত্র “কাবা ঘর”।

পরিশেষে বলব, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔

অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর; রাছুল (স:) এর নির্দেশ মান্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায় বিচারক তাদের নির্দেশও মান্য কর। (ছুরা নিসা-৫৯নং আয়াত)

সুতরাং আল্লাহ, রাসুল ও মুমিন বান্দা যারা ন্যায় বিচারক তথা আলেম। পীর মাশায়েখ ইমামগণ-এদের অনুসরণকে আল্লাহ তায়ালা ফরজ করে দিয়েছেন। আর যারা অনুসরণ যোগ্য তাদেরকে কিবলা বলা যাবে। তাছাড়া দেওবন্দী ওলামাদের পীর রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর মরছিয়া (মৃত্যুর পর শোকগাতা কবিতা) লিখতে গিয়ে মওলানা মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী বলেন-

جدھر کو آپ مائل تھے اور ہر ہی حق بھی دائر تھا
میرے قبلہ میرے کعبہ تھے حقانی سے حقانی

অর্থাৎ- (রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী) আপনি যে দিকেই মনোনিবেশ করতেন সে দিকেই হকের স্তম্ভ ছিল। তিনি সত্যি সত্যি আমার “কিবলা” ও কাবা ছিলেন। (মরছিয়ায় রশীদিয়া ৭ পৃ:)

আরো বলেন-

نمہ آپ کی جانب تو بعد ظاہری کیا ہے
ہمارے قبلہ و کعبہ ہو تم دینی و ایمانی

অর্থাৎ- (হে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী) আমরা যদি আপনার প্রতি মুখ রাখি তবে প্রকাশ্য দূরবর্তী কি? আপনিই হলেন আমাদের দ্বীনি ও ঈমানী “কিবলা ও কাবা”। (মরছিয়ায় রশীদিয়া ১১ পৃ:)

সহকারী অধ্যাপক : কাটিরহাট ফাযিল মাদ্রাসা।



তাকুওয়ার গুরুত্ব

মুহাম্মদ মুরশেদুল হক

ভূমিকা : মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শ্রেষ্ঠজীবের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে সকল মানুষ মর্যাদাগতভাবে সমান নয়। যেমন নবী-রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের মর্যাদা আমল করে অর্জন করা সম্ভব নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া মর্যাদা। তাঁরা ছাড়া অন্য সকল মানুষ সাধারণভাবে মর্যাদাগতভাবে আল্লাহর নিকট সমান; তবে তাঁদের আমল বা তাকুওয়ার ভিত্তিতে তাঁদের মর্যাদা ভিন্ন হয়ে যায়। কারণ আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানী হলো সেই ব্যক্তি, যিনি অধিক তাকুওয়াবান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- **۱- اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ**। এ কারণে আল্লাহর নৈকট্য পাবার জন্য তাকুওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আপনাদের সম্মুখে তাকুওয়ার গুরুত্ব কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ। তাকুওয়ার গুরুত্ব জানার পূর্বে তাকুওয়ার পরিচয় ও এর স্তর জানা প্রয়োজন। তাই প্রথমে তাকুওয়ার পরিচয়, তারপর গুরুত্ব আলোচনা করবো।

তাকুওয়ার পরিচয় : ‘তাকুওয়া’ শব্দটি আরবি বিশেষ্য। এটি **وَقِي** মূল অক্ষর থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো, রক্ষা করা, হেফাজত করা। এ অর্থের ব্যবহার পবিত্র কুরআনে এসেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-২

‘তিনি(আল্লাহ) তাঁদেরকে(জান্নাতি) জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।’ তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-৩ **فُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا**। ‘তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। ইমাম রাগিব বলেন- ‘তাকুওয়া’ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো-

التَّقْوَى جَعَلَ النَّفْسَ فِيْ وَقَايَةٍ مِّمَّا يَخَافُ .

‘ভীতিকর বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করা’। অতঃপর শব্দটি ‘ভয়-ভীতি’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।^৪ কুরআনে ‘তাকুওয়া’ (**تَقْوَى**) এর ক্রিয়াবাচক শব্দ ‘ইত্তাকু’ (**اتَّقُوا**) শব্দটি দু’টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হলো ভয় করা। এ অর্থই অধিক ব্যবহৃত হয়েছে। আর অপর অর্থ হলো বেঁচে থাকা বা বিরত থাকা। ‘তাকুওয়া’ (**تَقْوَى**)

শব্দটি অধিকাংশ সময় ‘মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে ‘তাকুওয়া’ (**تَقْوَى**) শব্দটি পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ১. ঈমান - আল্লাহর বাণী-

۱- اِنَّ الَّذِيْنَ يَّعْزُضُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِّلْتَّقْوَى .
এখানে **لِلْتَّقْوَى** দ্বারা ঈমানকে বুঝানো হয়েছে। ২. কালিমায়ে তাওহিদ - আল্লাহর বাণী-

وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى - এখানে কালিমায়ে তাওহিদ তথা **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ** কে বুঝানো হয়েছে।

উলামায়ে কিরাম তাকুওয়ার শরঈ অর্থ করতে গিয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তা থেকে কয়েকটি বলবো। ইমাম রাগেব ইসপাহানি বলেন-৫ **التَّقْوَى فِي تَعَارُفِ الشَّرْعِ حِفْظَ النَّفْسِ عَمَّا يُوْثِمُ**। ‘শরিয়তের পরিভাষায় তাকওয়া হলো পাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা।’ আল্লামা বায়যাভি বলেন-৬

اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة .



‘পরকালে ক্ষতি করবে এমন বিষয় থেকে যে নিজেকে রক্ষা করে, তাঁকে মুত্তাকি বলা হয়।’ এ পরিচয় থেকে বুঝা গেছে যে, তাকওয়া হলো পার্থিব জীবনে নিজেকে এমন বিষয় থেকে রক্ষা করা, যা পরকালে ক্ষতি করবে। আল্লামা ইসমাইল হক্কি বলেন-৭

التقوى وهي اسم جامع لكل بر من أعمال الظاهر وأحوال الباطن والقيام باتباع الموافقات واجتناب المخالفات وتصفية الضمائر ومراقبة السرائر.

‘তাকওয়া এমন একটি বিষয়ের নাম, যা সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পুণ্যকাজ, কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত কাজসমূহের অনুসরণ, কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকা, অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আত্মার পর্যবেক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করে।’ হযরত আলী রাডিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইরশাদ করেন-৮

هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل.

‘তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা, কুরআন অনুসারে আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।’ মোটকথা হলো-তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা এভাবে যে, তাঁর নির্দেশিত বিধান পালন করা আর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

তাকওয়ার স্তর :

আল্লামা বায়যাভি প্রমুখ তাকওয়ার তিনটি স্তর করেছেন। যথা-১. শিরক বা কুফর থেকে বিরত থাকা। এটি তাকওয়ার সর্বনিম্ন মানের স্তর। কারণ এর মাধ্যমে জাহান্নামের স্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-৯. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. ২. প্রত্যেক প্রকার গুনাহ থেকে বিরত থাকা এমনকি কতিপয় উলামায়ে কিরাম বলেছেন ‘সগীরাহ’ গুনাহ থেকে বিরত থাকা। শরিয়তের মধ্যে ‘তাকওয়া’ বলতে এ প্রকারকে বুঝানো হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-১০

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

৩. এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে নিজেকে বিরত রাখা, যা আল্লাহর স্মরণকে বাঁধা প্রদান করে। এটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। সূফিগণই এ স্তরের ধারক-বাহক। তাঁরা অনেক বৈধ কাজও করেন না, যা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-১১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ.

উপরোক্ত স্তরবিন্যাসটি হলো উলামায়ে কিরামের মতে। তবে সূফিয়ায়ে কিরামগণ বিভিন্নভাবে তাকওয়ার স্তরবিন্যাস করেছেন। হযরত হাসান বসরি আলাইহির রাহমাহর মতে, তাকওয়ার স্তর তিনটি। ১. সত্য কথা বলা ২. ঐ সকল কাজ থেকে বিরত থাকা, যেগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন ৩. আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানের উপর অটল থাকা। হযরত ইহইয়া বিন মুয়ায রাজি আলাইহির রাহমাহ বলেন-তাকওয়া দুই প্রকার। ১. জাহেরি বা প্রকাশ্য ও ২. বাতেনি বা অপ্রকাশ্য। জাহেরি তাকওয়া হলো বান্দার প্রত্যেকটি কাজ ও ইচ্ছা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া আর বাতেনি তাকওয়া হলো অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে স্থান না দেওয়া। ইমাম কুশাইরি আলাইহির রাহমাহর মতে তাকওয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে যেমন ১. আওয়াম বা সাধারণ মানুষের তাকওয়া হচ্ছে শিরক থেকে বাঁচা ২. খাছ বা আল্লাহর একনিষ্ট ব্যক্তিদের তাকওয়া হচ্ছে গুনাহ থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে প্রবৃত্তির কামনাকে ত্যাগ করা ৩. আহাচ্ছুল খাওয়াছ বা আল্লাহর অত্যন্ত কাছের ব্যক্তিদের তাকওয়া হচ্ছে প্রত্যেক



কাজে নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল বস্তুর দিকে মনযোগ দেয়া থেকে বিরত থাকা এবং শরিয়তের ফরয বিধানসমূহ আদায়ের সাথে সাথে প্রত্যেক কথা বার্তায় আল্লাহর বিধানের অনুস্মরণ করা। ১২

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, মুত্তাকী হতে হলে, প্রত্যেক গুনাহের কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে এবং প্রত্যেক আদিষ্ট বিধান তথা ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত কাজ আদায় করতে হবে।

আউলিয়ায়ে কিরামের তাকওয়া :

তাকওয়ার প্রকৃত রূপ আউলিয়ায়ে কিরাম ও সূফিয়ে কিরামের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন আউলিয়ায়ে কিরামের তাকওয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরাছি।

হযরত আবু হানিফা (রহঃ) এর তাকওয়া :

তাঁর তাকওয়ার ব্যাপারে অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, তা থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি। ১. ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাহ কোথাও যাবার সময় পথিমধ্যে নখ পরিমাণ সামান্য মাটি তাঁর কাপড়ে এসে লাগে। তিনি তা দজলা নদীর পানি দ্বারা ধৌত করলেন। এ ব্যাপারে মানুষেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মাযহাবে কাপড় অপবিত্র হবার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা আছে। তাই এ পরিমাণ মাটিতেতো আপনার কাপড় অপবিত্র হয়নি। তারপরও তা কেন ধৌত করলেন? তিনি বললেন-সেটি ছিলো ফতোওয়া আর এটি হচ্ছে তাকওয়া। ২. খলিফা মনসুর কাযি নিয়োগ করার জন্য হযরত আবু হানিফা, হযরত সুফইয়ান সাওরি, হযরত মিসইয়ার ও হযরত শরিক আলাইহিমুর রাহমাহকে তার দরবারে আহবান জানান। হযরত আবু হানিফা, হযরত সুফইয়ান সাওরি ও হযরত মিসইয়ার পথিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁরা কাযির পদে আসীন হবেন না। এজন্য ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাহ বললেন, আমি যে কোন বাহানায় এ পদ গ্রহণ করবো না। হে সুফইয়ান সাওরি, তুমি অন্যত্র পালিয়ে যাবে। তাই তিনি অন্যত্র চলে গেলেন। ইমাম আবু হানিফা হযরত মিসয়ারকে বললেন, তুমি সেখানে পাগলের বেশ ধারণ করবে। তাই খলিফা হযরত শরিককে কাযি নিয়োগ করবে। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হলো। প্রথমে খলিফা হযরত আবু হানিফাকে কাযির পদ গ্রহণ করার জন্য আহবান করলে, তিনি বললেন, আমি আরবিয় বংশোদ্ভূত নই। এ কারণে আরবের অধিবাসীরা আমার ফতোওয়া নির্ভরযোগ্য হিসেবে নিবে না। খলিফা বললেন, কাযি হবার জন্য আরবিয় বংশোদ্ভূত হবার কোন প্রয়োজন নেই; বরং ইলমের প্রয়োজন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তবে এ পদের যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। এ কথা শুনে খলিফা বললেন, আপনি মিথ্যা বলছেন। তখন ইমাম আজম বললেন, তাহলে একজন মিথ্যাবাদী কিভাবে কাযি হবে? আর যদি আমার কথা সত্য হয়, তখনও আমি কাযি হতে পারি না। তারপর হযরত মিসয়ারকে এ পদ গ্রহণ করতে বললে, তিনি পাগলের বেশ ধারণ করেন। তাই তিনিও কাযির পদে আসীন হননি। পরিশেষে হযরত শরিককে কাযি পদে নিয়োগ করেন। হযরত সুফইয়ান সাওরি আলাইহির রাহমাহ অন্যত্র চলে গেলেন। এঁরা কাযির পদ গ্রহণ করেননি। কারণ খলিফা ছিল অত্যাচারী স্বৈরশাসক। তাঁরা তাঁর অধীনে যথাযথ মত প্রকাশ করতে পারতেন না। এত বড় পদ পেয়েও তাঁরা গ্রহণ করেননি। এটা তাঁদের তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। ১৩

৩. কোন একজন ব্যক্তির জানাযায় ইমাম আজম উপস্থিত হলেন। তখন ছিল প্রচণ্ড গরম ও অত্যাধিক রোদ আর সেখানে ছিল একটি দেয়ালের ছায়া। মানুষেরা বললেন, হুজুর, এ দেয়ালের ছায়ায় তাশরিফ আনুন। তিনি বললেন, না। কারণ এ দেয়ালটি আমার কর্জ গ্রহীতার দেয়াল। কর্জ গ্রহীতার থেকে কোন ধরণের উপকার নেওয়া অবৈধ। কেননা হাদিস শরিফে রয়েছে, **كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ، فَهُوَ رِبَاٌ**।

‘এমন প্রত্যেক কর্জ, যা উপকার বয়ে আনে, তা (উপকার) সুদ।’ ১৪ মূলত এ ছায়া গ্রহণ সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতদসত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। এটা হচ্ছে তাঁর তাকওয়া। ১৫



ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এর তাকওয়া :

কোন একদিন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আলাইহির রাহমার খাদিম তাঁর ছেলে সালিহ এর রান্নাঘর থেকে ময়দা নিয়ে রুটি বানিয়েছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আলাইহির রাহমাহ্ জানতে পেরে বললেন, যে ব্যক্তি ইস্পাহানের একজন কাযি, তুমি তাঁর রান্না ঘর থেকে ময়দা নিয়ে কেন রুটি বানিয়েছ ? এ রুটি আমি খাওয়ার উপযুক্ত নয়। এগুলো কোন ফকিরকে দিয়ে দাও। কিন্তু চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোন ফকির আসেনি। দীর্ঘদিন থাকার কারণে এগুলো নষ্ট হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাই তাঁর খাদিম এগুলো দজলা নদীতে ফেলে দিলেন। এ কথা জানার পর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আলাইহির রাহমাহ্ এরপর থেকে দজলা নদীর মাছ খাননি। কারণ হয়ত এ রুটিগুলো মাছেই খেয়েছে। এটা হচ্ছে অনেক উচু মাপের তাকওয়া। অন্যথায় নদীর সকল মাছ এ রুটিগুলো খায়নি। এছাড়াও তাঁর ছেলে বৈধ সরকারি কাযি ছিলেন। তাঁর উপার্জিত সম্পদ খাওয়া ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আলাইহির রাহমার জন্য অবৈধ ছিল না। ১৬

হযরত আবু ইয়াযিদ বোস্তামির তাকওয়া :

হযরত আবু ইয়াযিদ বোস্তামি(বায়াজিদ বোস্তামি) আলাইহির রাহমাহ্ একজন উচু মাপের অলি ছিলেন। তাই তাঁর তাকওয়াও তত উচু মাপের ছিল। একদা তিনি একটি মরুভূমিতে কূপের পানিতে তাঁর কাপড় ধৌত করলেন। তাঁর একজন সঙ্গী বললেন, হুজুর, শুকানের জন্য এটি কি আগুর বাগানের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিব ? হুজুর বললেন - ‘না’। তুমি কি অন্যের দেয়ালে পেরেক প্রবেশ করাতে চাও? সঙ্গী বললেন, তাহলে কি গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিব? তিনি বললেন- ‘না’। এটি গাছের ডাল ভেঙ্গে দিতে পারে। সঙ্গী বললেন, তাহলে ঘাসের উপর বিছিয়ে দিবো ? তিনি বললেন - ‘না’। কারণ, এগুলো হলো প্রাণীর খাবার। আমরা তাদেরকে খাবার থেকে বঞ্চিত করতে পারি না। তারপর হুজুর নিজের পিঠটি সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি কাপড়টি আমার পিঠে দাও। তিনি কাপড়টি তাঁর পিঠে দিলেন। উপরিভাগ শুকানোর পর কাপড়টিকে উল্টিয়ে দেয়া হলো, যাতে অপর দিকও শুকিয়ে যায়। এভাবে কাপড়টি শুকানো হলো। ১৭ এটি হচ্ছে তাকওয়ার উচ্চ স্তর। অন্যথায় উপরোক্ত পদ্ধতিতে কাপড় শুকানোতে কোন পাপ নেই।

হযরত ইবরাহিম বিন আদহাম এর তাকওয়া :

হযরত ইবরাহিম বিন আদহাম আলাইহির রাহমাহ্ বলেন, ‘একদিন রাতে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে একটি পাথরের নিচে ঘুমোলাম। মাঝরাতে দু’জন ফেরেশতা এসে একজন অপরজনকে বললেন, এটা কে ? অপরজন বললেন, উনি ঐ ব্যক্তি, যার একটি মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা কমিয়ে দিয়েছেন। প্রথম প্রশ্নকারী বললেন, কেন ? দ্বিতীয় ফেরেশতা বললেন, তিনি বসরায় কিছু খেজুর ক্রয় করেছেন। তাঁর ক্রয়কৃত খেজুরের মধ্যে বিক্রেতার একটি খেজুর পড়েছে, যা তিনি আর বিক্রেতাকে ফেরত দেননি। হযরত ইবরাহিম বিন আদহাম আলাইহির রাহমাহ্ বলেন, তারপর আমি দ্রুত বসরায় গিয়ে পূর্বের ব্যক্তি থেকে কিছু খেজুর ক্রয় করে, তা পুনরায় তার খেজুরের মধ্যে ঢেলে দিলাম। তারপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে আসলাম। সেখানে একটি পাথরের নিচে ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝরাতে পুনরায় দু’জন ফেরেশতা এসে, একজন অপরজনকে বলল, উনি কে? অপরজন বললেন, উনি ঐ ব্যক্তি, যার মর্যাদা আল্লাহ ফিরায়ে দিয়েছেন। ১৮ একটি খেজুর ফেরত দেয়ার জন্য তিনি সুদূর বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বসরায় গিয়েছেন এবং বিক্রেতাকে অনেক গুণ বেশি খেজুর ফেরত দিয়ে পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন। এটি তাঁর উচ্চ তাকওয়ার প্রমাণ। নতুবা একটি খেজুর অনিচ্ছায় তাঁর ক্রয়কৃত খেজুরে থেকে যাওয়া অতি নগণ্য ব্যাপার।

হযরত রাবিয়া বসরির তাকওয়া :

হযরত রাবিয়া বসরি আলাইহার রাহমাহ্ কোন একদিন তাঁর ছেঁড়া কাপড় সুলতানের মশালের আলোতে সেলাই



করেছেন। এরপর তাঁর অন্তর পরিবর্তন হয়ে গেলো। কিছুদিন পর তাঁর মনে পড়ল যে, তিনি সুলতানের মশালের আলোতে তাঁর কাপড় সেলাই করেছেন। মনে হবার সাথে সাথে তিনি তাঁর কাপড়টি ছিঁড়ে ফেললেন। ১৯ এটি তাঁর পরহিজগারিতার প্রমাণ বহন করছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের তাকওয়া :

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রাহিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলতেন, ‘শত পয়সা সদকাহ করার চেয়ে অবৈধ পন্থায় একটি পয়সা গ্রহণ না করা অধিকতর উত্তম।’ এ বাক্যে তাকওয়ার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। তিনি হারাম অর্জন থেকে বেঁচে থাকাকে শতগুণ সদকার চেয়ে বেশি সওয়াব বলেছেন। তিনি শামের বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদিস শরিফ লিখতেন। একদা তাঁর কলমটি ভেঙ্গে যাবার কারণে তিনি অন্যজন থেকে একটি কলম ধার করে নেন। লিখার পর কলমটি ফেরত দিতে তিনি ভুলে গেলেন। তারপর তিনি শাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর কলমদানিতে দেখতে পেলেন যে, তাঁর ধারকৃত কলমটি সেখানে রয়ে গেছে। তিনি সাথে সাথে শামে এসে কলমটি মালিককে ফিরিয়ে দেন। ২০ একটি সামান্য কলম ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তিনি সুদূর পথ পাড়ি দিয়েছেন। এটা তাঁর তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ।

তাকওয়ার গুরুত্ব :

তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিমিত। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য কুরআন-সুন্নাহ রয়েছে। তা থেকে কয়েকটি আলোচনা করবো।

১. আল্লাহর নির্দেশ :

আল্লাহ তায়ালা অনেক আয়াতে তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তা থেকে কয়েকটি হচ্ছে

i. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-২১. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .**

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো।’

ii. তিনি আরো ইরশাদ করেন-২২. **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .** ‘তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো।’

iii. তিনি আরো ইরশাদ করেন-২৩. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ .**

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো।’

iv. তিনি আরো ইরশাদ করেন-২৪. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ .**

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর সত্যবাদীদের সাথে থেকো।’

v. তিনি আরো ইরশাদ করেন-২৫. **اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .** ‘তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহকে ভয় করো।’

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ‘তাকওয়া’ অবলম্বন করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

২. রাসূলে করিমের (সঃ) নির্দেশ :

অসংখ্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘তাকওয়া’ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। তা থেকে কয়েকটি বলবো।



i. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-২৬ :

اتَّقُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ.

‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো, রমদ্বান মাসের রোযা রাখো আর তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় করো।’

ii. তিনি আরো ইরশাদ করেন-২৭ . اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنْ نَفْسًا لَمْ تَمُوتْ حَتَّى تَسْتَوِي رِزْقَهَا .

‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালোভাবে রিযিক অন্বেষণ করো। কেননা, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না, যতক্ষণ না তার রিযিক পরিপূর্ণ হয়।’

iii. তিনি আরো ইরশাদ করেন- . اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ . ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার করো।’

iv. তিনি আরো ইরশাদ করেন-২৮ . أُوصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ . ‘আমি তোমাদেরকে আল্লাহ-ভীতির নির্দেশ দিচ্ছি।’

v. তিনি আরো ইরশাদ করেন-২৯

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى .

‘হে মানবকুল, সাবধান! নিশ্চয় তোমাদের প্রভু একজন আর তোমাদের (আদি) পিতাও একজন। (তাই) সাবধান! কোন অনারবি ব্যক্তির উপর আরবীয় ব্যক্তির মর্যাদা বেশি নয় এবং কোন আরবীয় ব্যক্তির উপরও কোন অনারবি ব্যক্তির মর্যাদা বেশি নয়। কোন হাবশীর উপর শ্বেত বর্ণের ব্যক্তির মর্যাদা বেশি নয়। অনুরূপভাবে কোন শ্বেত বর্ণের ব্যক্তির উপর কোন হাবশীর মর্যাদা বেশি নয়। তবে তাকওয়ার মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ হবে।’ অর্থাৎ মানুষ যে বংশেরই হোক না কেন, সবার মর্যাদা সমান। চাই সে আরব দেশের অধিবাসী হোক কিংবা অনারবি হোক। তবে তাদের মর্যাদা ভিন্ন তাদের তাকওয়ার ভিত্তিতে। যে যতটুকু তাকওয়াবান, সে ততটুকু মর্যাদাবান। তাই রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাবশীকেও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করেছেন।

আলোচ্য হাদিস শরিফে রাসূলে করিম (সঃ) ‘তাকওয়া’ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে আল্লাহকে ভয় করা অর্থ হলো-তাঁর আদিষ্ট বিধান আদায় করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করা।

৩. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য তাকওয়ার নির্দেশ : শুধু ইসলামে নয় ; বরং পূর্ববর্তী সকল মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ‘তাকওয়া’র নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ .

‘তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবকে এবং তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।’

তাকওয়ার গুরুত্ব :

তাকওয়ার মাধ্যমে উভয় জগতে সীমাহীন ফায়দা হয়ে থাকে। তা থেকে কয়েকটি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরবো।



ইহকালীন গুরুত্ব : তাকওয়ার ইহকালীন অনেক ফায়োদা রয়েছে, যা স্বল্প সময়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তা থেকে কয়েকটি মাত্র আলোচনা করব।

১. মুত্তাকির জন্য আল্লাহ তায়ালা পার্থিব কাজ সহজ করে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-৩০

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

‘যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার ইহকালীন কাজ সহজ করে দেন।’

২. বিপদ থেকে মুক্তি ও রিযিকের ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিদের জন্য বিপদ থেকে মুক্তির পথের সন্ধান দেন এবং ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-৩১

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

‘যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির) পথের ব্যবস্থা করে দেন এবং ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করেন।’ তিনি আরো ইরশাদ করেন-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

‘যদি জনপদবাসী ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি আসমান ও জমীনের নিয়ামতসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম।’ এ আয়াত শরিফ থেকে বুঝা গেল যে, তাকওয়া অবলম্বন করলে আসমান-জমীনের নিয়ামত পাওয়া যায়।

৩. তাকওয়া হচ্ছে আমল সংশোধন হওয়া ও পাপ ক্ষমা হবার মাধ্যম। তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তায়ালা নেক আমল সংশোধন করেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-৩২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ.

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।’

৪. তাকওয়ার মাধ্যমে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী শক্তি অর্জন হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-৩৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا.

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন।’

৫. তাকওয়ার মাধ্যমে দ্বিগুণ রহমত ও হিদায়তের আলো অর্জিত হয়। আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিদেরকে দ্বিগুণ রহমত ও হিদায়তের আলো প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا

تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ.

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাহলে তিনি তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, (সঠিক পথে) চলার জন্য তিনি তোমাদেরকে হিদায়তের আলো দিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।’



৬. তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় এবং তাঁর অলি হওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-৩৪. **إِنْ أُولَآئِهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ**।

‘আল্লাহ তায়ালা মুতাক্কিদের বন্ধু।’ **وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ**।

৭. মুতাক্কিগণ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-৩৫

وَإِنْ تَصُبُّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের (কাফের) ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।’

৮. তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর রহমত পাবার একটি কারণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-৩৬

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ। ‘আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টিত করে নিয়েছে। অতঃপর তা আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।’

৯. মুতাক্কিকে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন-৩৭. **فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ**। ‘নিশ্চয় আল্লাহ মুতাক্কিগণকে ভালোবাসেন।’

তাকওয়ার পরকালীন গুরুত্ব : তাকওয়ার পরকালীনও অনেক ফায়েদা রয়েছে, যা স্বল্প সময়ে পরিপূর্ণ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তা থেকে কয়েকটি মাত্র আলোচনা করব।

১. আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলো ‘মুতাক্কি’ ব্যক্তি। যার তাকওয়া যত বেশি হবে, আল্লাহর নিকট তার সম্মান তত বেশি হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-৩৮. **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ**।

‘তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান।’

২. মুতাক্কিগণ পরকালে সফলকাম হবে। এ বিষয়ে মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ।

‘যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে, তাঁরাই সফলকামী।’

৩. আল্লাহ তায়ালা শুধু মুতাক্কিদের আমল গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন-৩৯

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ।

‘আল্লাহ তায়ালা শুধু মুতাক্কিদের আমল কবুল করেন।’

৪. মুতাক্কিগণ জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে। পুলসিরাত পার হবার সময় প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কারণ পুলসিরাত জাহান্নামের ভিতর দিয়ে হবে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুতাক্কিগণকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেন-৪০

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا।



‘তোমাদের প্রত্যেকেই জাহান্নাম অতিক্রম করবে (পুলসিরাতে পার হওয়ার সময়ে)। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমি মুত্তাকিদেরকে (জাহান্নাম থেকে) নিষ্কৃতি দিব আর জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব।’

৫. মুত্তাকিদের জন্য জান্নাতে থাকবে বহুতল বিশিষ্ট প্রাসাদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ.

‘কিন্তু যারা তাঁদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাঁদের জন্য রয়েছে বহুতল বিশিষ্ট প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।’

৬. মুত্তাকিদের গুনাহ আল্লাহ মিটিয়ে দিবেন এবং তাঁদেরকে মহা পুরস্কার দিবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا.

‘যে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, তিনি তার পাপ মুছে দিবেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দিবেন।’

৭. কিয়ামতের দিনে মুত্তাকিগণ চিন্তিত হবেন না এবং তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-৪১

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

‘আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিগণকে (জাহান্নাম থেকে) উদ্ধার করবেন তাঁদের সাফল্যসহ। তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তাঁরা চিন্তিতও হবেন না।’

৮. মুত্তাকিগণ কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্র মেহমান হিসেবে হাশর করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. ‘যেদিন আমি মুত্তাকিগণকে অতি দয়াময় (আল্লাহ) ঐর নিকট সম্মানিত মেহমানরূপে একত্র করব।’

৯. জান্নাতকে মুত্তাকিগণের জন্য নিকটে আনা হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-৪২

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.

‘মুত্তাকিগণের জন্য জান্নাতকে নিকটে আনা হবে।’

১০. তাকওয়া হচ্ছে পরকালীন পাথেয়। এ পাথেয় অর্জনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন-৪৩

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى.

‘তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। আর সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।’

উপসংহার : যা আলোচনা করা হয়েছে, তা হলো তাকওয়ার গুরুত্ব। এ ছাড়া তাকওয়ার আরো অনেক গুরুত্বের কথা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ রয়েছে। ইমাম হাসান বসরি আলাইহির রাহমাহ বলেন, সামান্যতম পরহিজগারিতা হাজার রোযা ও নফল ইবাদত থেকে উত্তম। এ কারণে উভয় জগতে আমাদের সাফল্য পেতে হলে, তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত।

১. আল-কুরআন, সূরা হুজরাত, আয়াত নং-১৩।

২. প্রাণ্ডক্ত, সূরা ইনসান, আয়াত নং-১১।

৩. প্রাণ্ডক্ত, সূরা রাদ, আয়াত নং-৩৭।



৪. ইমাম রাগিব, আল-মুফরাদাত, (বৈরুত : দারুল কলম, ১৪১২ হি.), পৃ. ৮৮১।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. বায়যাতি, আনওয়ারুত তানযিল, (বৈরুত : দারুল ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরবি, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৬।
৭. আল্লামা ইসমাইল হক্কি, রুহুল বয়ান, (বৈরুত : দারুল ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরবি), খ. ১, পৃ. ২৪৯।
৮. ড. আমির হাসাস, তুরিকুল মুহতাদিয়াত, (প্র. অনু, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.), পৃ. ৮।
৯. আল-কুরআন, সূরা-ফাতাহ, আয়াত নং-২৬।
১০. প্রাগুক্ত, সূরা আ'রাফ, আয়াত নং-৯৬।
১১. প্রাগুক্ত, সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১০২।
১২. আলাম ফাকরি, মানাযিলে বিলায়াত, (দিল্লি : রিজভি কিতাব ঘর, ১৯৯৪ ইং), পৃ. ২৯৬-২৯৮।
১৩. ইমাম শারানি, আত-তাবকাতুল কুবরা, (প্র. ও তা. বি.), পৃ. ৫০।; আলাম ফাকরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৫।
১৪. ইবনু আব্বি শাইবা, আল মুসন্নাফ, (রিয়াদ : দারুল রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩২৭।
১৫. ইমাম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুরাইশিয়াহ, (কায়রো : দারুল মায়ারিফ, প্র. ও তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২৩০।; আলাম ফাকরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৫।
১৬. আলাম ফাকরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।
১৭. ইমাম কুশাইরি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩০।
১৮. ইমাম কুশাইরি, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ২৩০-২৩১।
১৯. প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ২৩৭।
২০. আলাম ফাকরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।
২১. আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত নং-৭০।
২২. প্রাগুক্ত, সূরা তাগাবুন, আয়াত নং-১৬।
২৩. প্রাগুক্ত, সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১০২।
২৪. প্রাগুক্ত, সূরা, তাওবা, আয়াত নং-১১৯।
২৫. প্রাগুক্ত, সূরা মায়দা, আয়াত নং-১১২।
২৬. ইমাম তিরমিযি, আস, সুনান, (বৈরুত : দারুল ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরবি), খ. ২, পৃ. ৫১৬।
২৭. ইমাম ইবন মাজাহ, আস-সুনান, (বৈরুত : দারুল ফিকর), খ. ২, পৃ. ৭২৫।
২৮. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবি), খ. ৪, পৃ. ৩২৯।
২৯. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ (বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি.), খ. ৩৮, পৃ. ৪৭৪।
৩০. আল-কুরআন, সূরা-তালাক, আয়াত নং-৪।
৩১. প্রাগুক্ত, আয়াত নং : ২-৩।
৩২. প্রাগুক্ত, সূরা আহযাব, আয়াত নং-৭০-৭১।
৩৩. প্রাগুক্ত, সূরা আনফাল, আয়াত নং-৭০-৭১।
৩৪. প্রাগুক্ত, আয়াত নং-৩৪।
৩৫. প্রাগুক্ত, সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১২০।
৩৬. প্রাগুক্ত, সূরা আ'রাফ, আয়াত নং-১৫৬।
৩৭. প্রাগুক্ত, সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৭৬।
৩৮. প্রাগুক্ত, সূরা হুজুরাত, আয়াত নং-১৩।
৩৯. প্রাগুক্ত, সূরা মায়দা, আয়াত নং-২৭।
৪০. প্রাগুক্ত, সূরা মারইয়াম, আয়াত নং-৭১-৭২।
৪১. প্রাগুক্ত, সূরা যুমার, আয়াত নং-৬১।
৪২. প্রাগুক্ত, সূরা : শুআরা, আয়াত নং-৯০।
৪৩. প্রাগুক্ত, সূরা বাকারা, আয়াত নং-১৯৭।

সহকারী অধ্যাপক : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।



মাইজভাগুরী (কঃ)'র আধ্যাত্মিক পরিচিতি

চট্টগ্রাম জেলার মাইজভাগুর গ্রাম- ছায়াঘেরা পাখী ডাকা বাগানতুল্য এক নিভৃতি শান্তিময় পল্লী, যাহার অধ্যাত্ম শরায়তের কল্যাণে সারা বিশ্বে ইহা “মাইজভাগুর দরবার শরীফ” নামের খ্যাত সেই মহান গাউছুল আজম মাইজভাগুরী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ)'র এই স্থানে ১২৩৩ বাংলা (১৮২৬ খৃষ্টাব্দ) ১লা মাঘ শুভ আবির্ভাব হয়। দেশীয় শিক্ষা শেষে হিজরী ১২৬০ সনে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং অধ্যয়ন শেষে তিনি যশোরে কাজী পদে যোগদান করেন। উক্ত পদে ইস্তফা দেওয়ার পর কলিকাতায় মুন্সী বু আলী ছাহেবের মাদরাসার প্রধান মোদারেরেছ পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার পেশায় কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বিল আছালত বা স্বভাব সিদ্ধ জন্মগত অলীউল্লাহ ছিলেন। মোখালেফাতে নফছ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণে বিল মালামাত বেলায়ত অর্জন করেন। হজরত পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এর বংশধর ও কাদেরীয়া তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত গাউছে কাউনাইন হযরত শেখ সৈয়দ আবু শাহামা ছালেহ আল কাদেরী লাহোরী (রঃ) এর দস্তে বায়াত গ্রহণ করিয়া গাউছিয়তের খোদা-দাদ খনি এবং পীরে তরিকতের বড় ভাই হযরত সৈয়দ দেলোয়ার আলী পাকবাজ (রঃ) হতে এত্তেহাদী কুতুবিয়তের ফয়জ হাসিল করিয়া কামেলে মোকাম্মেল হন। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে অনাবিল করুণা বর্ষনের পর ১৯০৬ ইং, ২৩ শে জানুয়ারি, সোমবার এই মহান গাউছুল আজম ওফাত প্রাপ্ত হন।

ওফাতের পূর্বে তিনি অর্জিত গাউছিয়ত কুতুবিয়তের মহিমা সমৃদ্ধ শরায়ত জারী রাখার লক্ষ্যে নিজ আদরের নাতী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) কে “বালেগ” ঘোষণা করে নিজ গদীতে বসানোর মাধ্যমে সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে যান, যিনি ১৯৮২ সালে ওফাত প্রাপ্ত হন।


পুনরায় সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম (কঃ) ওফাতের পূর্বে এই শরায়তের ধারা জারী রাখার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সনে নিজ ৩য় পুত্র হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ) কে তাঁহার রচিত মানব সভ্যতা বই-এ “যোগ্যতম” ঘোষণা এবং জীবদ্দশায় প্রকাশিত জরুরী বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহার গদীর স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে শিক্ষা দীক্ষা শজরা দান ফতুহাত নিয়ন্ত্রন অধিকার সম্পন্ন, এই গাউছিয়ত জারী সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করে যান। হযরত কেবলা কাবার গাউছিয়ত কুতুবিয়তের মহিমা সমৃদ্ধ শরায়তের এই ধারা শজরা প্রাপ্ত মনোনীত সাজ্জাদানশীনের মাধ্যমে হাশর তক্ জারী থাকিবে। -ইনশাআল্লাহ।

শজরায়ে আহমদিয়া কাদেরীয়া গাউছিয়া

- (১) হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ)
- (২) আমিরুল মোমেনীন হজরত আলী (রাঃ)
- (১৮) পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ)
- (৩৭) গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)
- (৩৮) সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোকরা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ)
- (৩৯) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্জ হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃজিঃআঃ)
- (৪০) নায়েব সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্জ সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃ)



গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মেধাবৃত্তি-২০১৭ এর টেলেন্টপুল, এ-গ্রেড ও সাধারণ গ্রেডে
বৃত্তি প্রাপ্ত বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণি ভিত্তিক ছবি ও রোল নম্বর

					
টেলেন্টপুল ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭০৪২	টেলেন্টপুল ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭০৩১	টেলেন্টপুল ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭০১০	এ-গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭০০১	এ-গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭০৪১	এ-গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭৫৪৪
					
জেনারেল গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭৫৮৮	জেনারেল গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭০১৬	জেনারেল গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭০৪৪	জেনারেল গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭৫৬৫	বিশেষ গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭৫৬২	বিশেষ গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭৫২৩
					
বিশেষ গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭৫৪৮	বিশেষ গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭০০৬	বিশেষ গ্রেড ৭ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৭৫০৩	এ-গ্রেড ৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৯০১৮	জেনারেল-গ্রেড ৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৯০২৪	জেনারেল-গ্রেড ৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৯৫০৯
					
জেনারেল-গ্রেড ৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৯০৩০	জেনারেল-গ্রেড ৭ম শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৯০৩২	টেলেন্টপুল ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৫৬৮	টেলেন্টপুল ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৫৮১	টেলেন্টপুল ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৬০৪	এ-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৫৩৫
					
এ-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৫১৪	এ-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৫৯৯	জেনারেল-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৫৫২	জেনারেল-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৫১২	জেনারেল-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬০৫২	জেনারেল-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৫১৬



গাউছুল আজম মাইজভাঙ্গারী মেধাবৃত্তি-২০১৭ এর টেলেন্টপুল, এ-গ্রেড ও সাধারণ গ্রেডে
বৃত্তি প্রাপ্ত বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণি ভিত্তিক ছবি ও রোল নম্বর

বিশেষ-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৫৩৩	বিশেষ-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬০৬২	বিশেষ-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬০২৬	বিশেষ-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৫৩৮	বিশেষ-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৬৫০১	টেলেন্টপুল ৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৮০৬০
এ-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৮০১৯	এ-গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৮৫১০	জেনারেল গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৮০২১	জেনারেল গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৮০০৫	জেনারেল গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৮৫১৫	জেনারেল গ্রেড ৬ষ্ঠ শ্রেণি (মাদ্রাসা) রোল নং- ৮৫০৫
টেলেন্টপুল ৫ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৫০২৭	টেলেন্টপুল ৫ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৫০৪৯	টেলেন্টপুল ৫ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৫০২৬	এ-গ্রেড ৫ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৫০৩১	এ-গ্রেড ৫ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৫০২৫	এ-গ্রেড ৫ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৫০৭৯
জেনারেল-গ্রেড ৫ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৫০১৫	জেনারেল-গ্রেড ৫ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৫০১১	জেনারেল-গ্রেড ৫ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৫০৭৮	জেনারেল-গ্রেড ৫ম শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৫০৫৮	টেলেন্টপুল ৪র্থ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৪০২৮	টেলেন্টপুল ৪র্থ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৪১০০
টেলেন্টপুল ৪র্থ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৪০৯৭	এ-গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৪০৭৭	এ-গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৪০৮০	এ-গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৪০২৪	জেনারেল-গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৪০৭২	জেনারেল-গ্রেড ৪র্থ শ্রেণি (স্কুল) রোল নং- ৪০৭৯



সংগঠন সংবাদ

গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর ১১২তম ওরশ শরীফ উপলক্ষে প্রশাসনিক সমন্বয় সভা

১০ মাঘ ২৩ জানুয়ারী গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) ঐর ১১২তম বার্ষিক ওরশ শরীফ উপলক্ষে ফটিকছড়ি উপজেলা প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে গাউছুয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে এক প্রশাসনিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের মত এ বছরও আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্জ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ) ঐর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় উক্ত ওরশ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওরশ শরীফের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, ওরশ শরীফে আগত আশেক ভক্ত মুরিদান ও জায়েরীনদের জানমালের সার্বিক নিরাপত্তা, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবেশ বান্ধব স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানীয়, প্রয়োজনীয় ঔষধসহ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও এম্বুলেন্স এবং ওরশ শরীফ সূষ্ঠ ভাবে সফল করার লক্ষ্যে মাইজভাগুরী ওরশ শরীফ সুপারভিশন কমিটি, ফটিকছড়ি উপজেলা প্রশাসন, পল্লী বিদ্যুৎ, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও পাঁচ পাড়ার সরদারগণের সাথে এই সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় পুরো ওরশ শরীফ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালনের জন্য আন্তরিক আশাবাদ ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানকে প্রাঞ্জল, ভক্ত আশেক মুরিদানদের পবিত্র সমাবেশে আইন-শৃংখলা রক্ষা, আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা সর্বোপরি ইসলামিক শরীয়ত মোতাবেক মাহফিলকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

শেখ মুহাম্মদ আলমগীরের সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উক্ত প্রশাসনিক সভার কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী মেজিস্ট্রেট (ভূমি)। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীন আলহাজ্জ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ)। অনুষ্ঠানে নায়ের সাজ্জাদানশীন আলহাজ্জ সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃ), ফটিকছড়ি থানা, ফটিকছড়ি উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, নাজিরহাট হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি, পল্লী বিদ্যুৎ, স্থানীয় সাংবাদিক, নানুপুর, বখতপুর, রোসাংগিরীসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের পক্ষে প্রতিনিধিবৃন্দ, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, চট্টগ্রাম জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা ও শাখা কর্মকর্তাগণ, পাঁচ পাড়ার সরদারগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিশেষে ওরশ শরীফ সূষ্ঠ ও সফল ভাবে সম্পন্ন এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি শৃংখলা ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহর শাহী দরবারে মিলাদ ও মোনাজাত পেশ করা হয়।

মাইজভাগুরী শরীফে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠানে সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী বলেন-



স্বেচ্ছায় রক্তদানকারী মানুষের অন্তর মানব ও মানবতার জন্য ভালবাসায় পরিপূর্ণ

“আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া) সংগঠনের অনুসারীরা আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি নিজেদেরকে মানব ও মানবতার সেবায় নিয়োজিত রাখছেন। এসব কাজে অংশগ্রহণের কারণে অন্যদের স্বীকৃতি, সম্মান তারা পাচ্ছেন। যা কিশোর-তরুণদের মানসিক পরিপক্বতা ও সুস্থতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলশ্রুতিতে তারা জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকানোর অন্যতম কারন quest of significance এর আশঙ্কামুক্ত।” মাইজভাগুর দরবার শরীফে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কার্যক্রম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (মঃ) এ কথা বলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আরো উল্লেখ করেন, “স্বেচ্ছায় রক্তদানের মত মানব কল্যাণমূলক কর্মসূচীগুলোতে অংশগ্রহণের কারণে মানুষের অন্তর মানব ও মানবতার জন্য ভালবাসায় পরিপূর্ণ। এমন হৃদয়ের মানুষের পক্ষে নির্বিচারে মানুষ হত্যা বা কারো ক্ষতি করা প্রকৃতিগতভাবেই অসম্ভব। মাইজভাগুরী তুরীকার অনুসারীরা নিজের জন্য যেমন সৃজনশীল তেমনি ধর্ম, পরিবার, দেশ, জাতি ও বিশ্বমানবতার জন্যও কল্যাণময় ও সৃজনশীল।”

গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এর ১১২তম ওরশ শরীফ উপলক্ষে অওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ) কর্তৃক মানবকল্যাণে গৃহিত কর্মসূচীর আওতায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী ও বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় গত ১৪ জানুয়ারি রবিবার, ১লা মাঘ সকাল ১০ টায় মাইজভাগুর দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া) ফটিকছড়ি উপজেলা কার্যকরী সংসদের আয়োজনে ও মাইজভাগুরী শাহ্ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনর্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা করেন চট্টগ্রাম ফাতেমা বেগম রেড ক্রিসেন্ট রক্তদান কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিভিন্ন শাখার সদস্য ছাড়াও মাইজভাগুর পাঁচ পাড়ার এলাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ মহতী কার্যক্রমে ৯০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন এবং প্রায় দুই শতাধিক মানুষের বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করার পাশাপাশি উপস্থিত সকলের মাঝে স্বেচ্ছায় রক্তদানের সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন এনায়েতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, খরায় শুকিয়ে যাওয়া কোন গাছ এক পশলা বৃষ্টিতে যেমন নতুন জীবন ফিরে পায় তেমনি রোগাক্রান্ত কোন রোগী এক ব্যাগ রক্তের মাধ্যমে নতুন জীবন লাভ করতে পারে। প্রতিবছর হাজারো রোগী রক্তের অভাবে অকালে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। এই বিপুল জনগোষ্ঠীতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে স্বেচ্ছায় রক্তদানের কোন বিকল্প নেই। মানবসেবায় মাইজভাগুরী তরীকার অনুসারীরা এই সেবার ধর্ম প্রজ্জ্বলিত রেখে সমাজের কোণায় কোণায় মানব ছটার দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করছে।”

অনুষ্ঠানে ফাতেমা বেগম রেড ক্রিসেন্ট রক্তদান কেন্দ্র মেডিকেল ইনচার্জ ডাঃ মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীন তাহের, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালীম প্রধান শিক্ষক, আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অধ্যাপক মেজবাউল আলম শৈবাল, চট্টগ্রাম জেলার জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক শেখ শাকিল মাহমুদ, রাউজান উপজেলার কার্যকরী সংসদের সভাপতি মুহাম্মদ ইউনুস মিয়া, ফটিকছড়ি উপজেলা কার্যকরী সংসদের সভাপতি এটিএম মুছা ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলাউদ্দীনসহ অন্যান্য সকল কর্মকর্তা এবং মাইজভাগুরী শাহ্ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনর্স গ্রুপ এর সদস্যবৃন্দ সহ বিপুলসংখ্যক আশেপাশে ভক্ত মুরিদ এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।



গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর

১১২তম বার্ষিক ওরশ সম্পন্ন

দেশি বিদেশি লাখো লাখো আশেক ভক্তের আমিন আমিন ধ্বনিতে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিগত ২৩ জানুয়ারী, ১০ মাঘ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে আখেরী মুনাযাতের মাধ্যমে শেষ হলো উপমহাদেশের প্রখ্যাত অলি ও আধ্যাত্মিক সাধক মাইজভাগুর দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ, বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক আওলাদে রাসুল, গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর ১১২ তম বার্ষিক ওরশ শরীফ। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহান ওরশ শরীফে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এবং দেশের সার্বিক সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে আখেরী মুনাযাত পরিচালনা করেন গাউছুল আজম মাইজভাগুরীর শজরার ধারাবাহিকতায় মনোনীত বর্তমান সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসুল, আলহাজ্জ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ)।



ওরশে আগত আশেক-ভক্তের উদ্দেশ্যে আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীন আলহাজ্জ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ) বলেন- “গাউছুল আজম হযরত শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (কঃ) আল্লাহর নৈকট্য লাভের সহজ পন্থা মাইজভাগুরী তুরিকার প্রবর্তন করেন। কোরআন ও হাদিস ভিত্তিক ইসলামের মৌলিক ভাবাদর্শের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত মাইজভাগুরী তুরিকা ধর্মীয় এবাদাত পালনের সাথে সাথে নৈতিক পরিশুদ্ধির উপর প্রাধান্য দেয়। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নাস্তিক্যতাবাদের বিরুদ্ধে এই তুরিকা এক কার্যকর শান্তিপূর্ণ মাধ্যম। বিশ্ব মানবতার জন্য হযরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) ঐর এই দুর্লভ অবদান আবহমান কাল পর্যন্ত স্থায়ী ও অবিকৃত থাকবে।

তিনি তাঁর বক্তব্যে আরো উল্লেখ করেন- “চরমপন্থা ও অসহিষ্ণুতার বিষবাস্পে আক্রান্ত অন্তঃকরণকে খোদায়ী প্রেম সলীলায় অবগাহন করিয়ে মানবতার শীর্ষ শিখরে পৌছানোর জন্য গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (কঃ) ঐর প্রতিষ্ঠিত মাইজভাগুরী তুরিকার ঐশী প্রেম নির্ভর শিক্ষা ও ইসলামী শরিয়ত ভিত্তিক চর্চা কার্যকর ভূমিকা রাখছে।”



ওরশ শরীফে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব সৈয়দুল হক খান, আলহাজ্ব ক্যাপ্টেন সৈয়দ সোহেল হাসনাত, আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম চৌধুরী, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের কর্মকর্তা, অঙ্গসংগঠন, জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা, শাখা দায়রা, খেদমত কমিটির কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

প্রতি বছর ১০ মাঘ ২৩ জানুয়ারি আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) ঐর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে উক্ত ওরশ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত এই ওরশ শরীফ সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আওলাদে রাসুল, নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোত্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:)।

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতি বছর এই ওরশ শরীফে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাশাপাশি ভারত, পাকিস্তান, মায়ানমার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ওমানসহ বিভিন্ন দেশ থেকেও পীর মাশায়েখ, আলেম-ওলামা, মুরিদান, ভক্ত, জায়েরীন, পর্যটক ও গবেষকরা (৮-১০ মাঘ) তিনদিন ব্যাপী এ ওরশ শরীফে অংশগ্রহণ করেন। ওরশ শরীফ চলাকালে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ ও আশপাশের এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। জিকির, মিলাদ ও ছেমা মাহফিলের ধ্বনিতে পুরো এলাকা মুখরিত ছিল। আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ জিকির, মিলাদ ও ছেমা মাহফিলের ধ্বনিতে পুরো এলাকা মুখরিত হতে থাকে। নারায়ণ তাকবীর-আল্লাহ্ আকবর, নারায়ণ রেসালাত-এয়া রাসুল্লাহ্ (সঃ), নারায়ণ গাউছিয়া-এয়া গাউছুল আজম দস্তগীর, নারায়ণ গাউছিয়া-এয়া গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী, রাসুলে পাকের তাজধারী-গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী সহ বিভিন্ন শ্লোগানে পথঘাট মুখরিত করে লাখো ভক্ত মুরিদ এ ওরশ শরীফে অংশগ্রহণ করেন।

তিনদিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে প্রতিদিন খতমে কোরআন, খতমে গাউছিয়া, নাতে রাসুল ও শানে গাউছিয়া পরিবেশন, বিজ্ঞ আলেম ও দারুত তায়ালীম প্রতিনিধির মাধ্যমে কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা এবং ছেমা মাহফিল করা হয়। এছাড়া জায়েরীনদের প্রতিটি ক্যাম্পে প্রতি ওয়াক্তে জামাত সহকারে নামাজ আদায় এবং ইবাদাত বন্দেগী করার সুব্যবস্থা করা হয়। ৯ মাঘ দুপুর ১২ টায় হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরীফে গোসল ও গিলাপ চড়ানো হয়। ১০ মাঘ দিবাগত রাত ১২ টা ০১ মিনিটে এ মহান ওরশ শরীফে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এবং দেশের সার্বিক সুখ সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:)।

ওরশে আগত লাখো লাখো আশেক, ভক্ত, জায়েরীন, মুরিদানগণের সার্বিক নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ফটিকছড়ি উপজেলা প্রশাসন, র‍্যাব, পুলিশ, আনসার, ফায়ার সার্ভিস এবং মাইজভাণ্ডার ওরশ শরীফ সুপারভিশন কমিটির বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও মাইজভাণ্ডারী স্পেশাল ফোর্স (এম.এস.এফ) দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া আইটি বিভাগের উদ্যোগে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও ভিডিও চিত্রধারণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হয়। এছাড়া ওরশ শরীফ উপলক্ষে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় গাড়ি পার্কিংসহ মেহমানদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে থাকা, সময়মতো জামাত সহকারে নামাজ আদায় করা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, আলোকসজ্জা, এবং প্রয়োজনীয় ওষুধসহ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয়। ওরশ শরীফকে ঘিরে বিগত দুইমাস যাবত আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এবং এর অঙ্গসংগঠনগুলো সাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পালন করে। কার্যক্রমসমূহের মধ্যে



গরীব দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প, রক্তদান কর্মসূচী, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, স্কুল ভিত্তিক মেধা বিকাশ কার্যক্রম, বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার, ফেস্টুন, তোরণ দিয়ে সাজানো এবং ফটিকছড়ির (সদ্যবিদায়ী) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক সমন্বয় সভা করা হয়।

মাইজভাণ্ডার ওরশ শরীফ সুপাভিশন কমিটির সভাপতি আওলাদে রাসুল, নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোস্তাজেমে দরবার আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) ওরশ শরীফ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং আগত আশেক-ভক্ত, স্থানীয় জনগণ, স্বেচ্ছাসেবক, প্রশাসন ও আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

দক্ষিণ খুলশীস্থ মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফে মাসিক তরীকত মাহফিল অনুষ্ঠিত।

আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:) ছাহেব কেবলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে গাউছিয়া আহমদিয়া (মাইজভাণ্ডারী খানকা শরীফ), ৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম-এ প্রতি মাসের প্রথম বুধবার, বাদ মাগরিব মাসিক তরীকত মাহফিল এবং প্রতি বুধবারে তরীকত ও জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আহসানুল হক বাদলের পরিচালনায় মাহফিলে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, না'তে রাসুল (সঃ) পাঠ এবং শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে মাহফিল শুরু করা হয়। মাহফিলে আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:) ছাহেব কেবলা কর্তৃক অনুমোদিত লিখিত বক্তব্য পাঠ, মিলাদ ও জিকির পরিচালনা করেন দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী। মাহফিলে আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ), আঞ্জুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ সহ, জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটির সদস্যসহ অসংখ্য আশেক, ভক্ত ও মুরাদানগণ উপস্থিত ছিলেন।

আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:) ছাহেব বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি শৃংখলা ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহর শাহী দরবারে মোনাজাত পেশ করা হয়। মোনাজাতের পর পবিত্র এশার নামাজ আদায় করা হয়।

২৭ রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন্নবী (স:) মাহফিলে সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী বলেন-

রাসুল পাক (স:) ঐর শাফায়াত ছাড়া কেউ নাজাত পাবে না

“হাসরের ময়দানে রাসুল পাক (স:) ঐর শাফায়াত ছাড়া কেউ নাজাত পাবে না। হাসরের ময়দানে একটি দল আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের মিলন প্রত্যাশি হবে। আর তারা হচ্ছে যারা দুনিয়াতে থাকতে রাসুলের মুহাব্বত নিয়ে আমল করেছে। যার ওয়াদা আল্লাহ কোনআন শরীফে দিয়েছেন যে- কোন বান্দার নেক আমলকে আমি বৃথা যেতে দিব না।” গত ২৭ রবিউল আউয়াল মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী (স:) মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন- যারা রসুল প্রেমিক নয় তারা কখনো ইসলাম প্রেমিক হতে পারে না। নবী প্রেমিক তৈরীর প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর দরবার। মাইজভাণ্ডার দরবার



শরীফ হচ্ছে খাতেমুল বেলায়েতে ওজমার দরবার। ইসলামের আলোর প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য সুন্নি ওলামায়ে কেরামগণের প্রয়োজনীয়তা যুগে যুগে অতি প্রয়োজন।



মাহফিলে বক্তারা বলেন- রসুল প্রেম ঈমানের মাপকাটি। আর অলী আল্লাহর দরবার হচ্ছে আল্লাহর রহমতে স্টেশন। মাইজভাগুরে আসলে মানুষের ঈমান মজবুত থেকে মুজবুত হয়। যারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হয় তারা আল্লাহর অলীদের দরবারে ছুটে যায়।

হাজারো মুসলিম জনতার উপস্থিতিতে এবং ধর্মীয় ভাব গম্বির পরিবেশে আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্জ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:জি:আ:) এর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ২৭ রবিউল আউয়াল, ১৬ ডিসেম্বর-২০১৭ শনিবার বাদ জোহর থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত পবিত্র জশনে ঈদে মিলাদুনবী (স:) মাহফিলের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি মাইজভাগুর দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল শাহী ময়দানে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ওলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ, গবেষক, বিভিন্ন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুফতি, মুহাদ্দিস, মোফাস্সির, আলোচকগণ তকরির পেশ করেন।

মাহফিলে ছদারত ও আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্জ হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:জি:আ) এবং মাহফিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সাজ্জাদানশীন হুজুর কেবলার একমাত্র শাহজাদা আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্জ সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগুরী (ম:)। উক্ত নুরানী মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইমামে আহলে সুন্নাত হযরতুলহাজ্জ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাসেমী (ম:)। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীয়ে মিল্লাত হযরতুলহাজ্জ অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল মুনাওয়ার (ম:) এবং শেষে মিল্লাত শায়খুল হাদিস হযরতুলহাজ্জ আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী।



বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, আলহাজ্ব সৈয়দুল হক খান, ক্যাপ্টেন সৈয়দ সোহেল হাসনাত ও আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম চৌধুরী।

ওয়ায়েজীনে কেরামদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হযরতুলহাজ্ব আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী, হযরতুলহাজ্ব অধ্যক্ষ আল্লামা ক্বারী সৈয়দ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল কাদেরী, ভারত থেকে আগত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা ক্বারী মুহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন বরকাতী, হযরতুলহাজ্ব অধ্যক্ষ মওলানা আহমদ হোসাইন আলকাদেরী, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি বখতেয়ার উদ্দীন আল কাদেরী।

শেখ মুহাম্মদ আলমগীর এবং মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুরের যৌথ পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (স:) ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে মাহফিলের কার্যক্রম শুরু করা হয়। মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হযরতুলহাজ্ব মওলানা হোসাইন আহমদ ফারুকী, আলহাজ্ব মওলানা আবদুস শুকুর আনসারী, অধ্যক্ষ হাফেজ মওলানা আবু জাফর ছিদ্দিকী, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইবরাহিম আল কাদেরী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা বদরুদ্দোজা, হযরতুলহাজ্ব মওলানা মঈনুদ্দীন হেলালী, হযরতুলহাজ্ব মওলানা বশিরুল আলম, মওলানা মুহাম্মদ এনাম রেজা কাদেরী, মওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ চৌধুরী, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ মারফত নুর, আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন, মওলানা নঈমুল হক নঈমী আল কাদেরী, মওলানা মুহাম্মদ হাসান আযহারী, মওলানা মুহাম্মদ ফোরকান হাসেমী, মওলানা মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন হাসেমী, মওলানা আবুল এরফান হাসেমী, মওলানা মুহাম্মদ মোদাচ্ছের হাসেমী, মওলানা জিয়াউদ্দীন হাসেমী, মওলানা মুহাম্মদ মইনুদ্দীন, মওলানা মুহাম্মদ দিদার ও আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সচিব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব, দারুত তাযালীমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী সহ দেশ বরণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ওলামায়ে কেরামগন উপস্থিত ছিলেন। আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্র, অঙ্গসংগঠন, জেলা, মহানগর, উপজেলা, শাখা দায়রা, খেদমত কমিটি সহ হাজারো আশেক, ভক্ত, মুরিদান ও স্থানীয় নবীপ্রেমিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মিলাদ, কিয়াম, জিকির শেষে মাহফিল সফলকাম, শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, শৃংখলা, কল্যাণ ও মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাত করা হয়। উপস্থিত সকলকে তবরুক বিতরণের মাধ্যমে মাহফিল সমাপ্ত হয়।

২৫ ডিসেম্বর ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী বলেন-

“মানব কল্যাণ মানবতার মুক্তির অন্যতম সোপান।”

আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী বলেন- মানব কল্যাণ মানবতার মুক্তির অন্যতম সোপান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে মানবতার শ্রেষ্ঠ গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করে আশরাফুল মাখলুকাতে মর্যাদা দিয়েছেন। তাই মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে সৃষ্টির সেরা জীবের দায়িত্ব পালন করা হবে। নিঃস্বার্থে মানব জাতির সেবা করা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ইবাদতের মধ্যে শামিল। গত ২৫ ডিসেম্বর মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে মানবতার সেবায় ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প সভাপতির বক্তব্যে আওলাদে রাসুল নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) এসব কথা বলেন।

এছাড়া তিনি আরো বলেন- মানবতার মুক্তির উৎকৃষ্ট পন্থা হিসাবে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হজরত মওলানা শাহ্



ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) 'মাইজভাগুরী তরিকা' প্রবর্তন করেন। এই তরিকার মূল ও মূখ্য লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার সেবা এবং আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে মানব আত্মা পরিশুদ্ধ করে রূহানী উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসেল করা।



আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:জি:আ:) এর পৃষ্ঠপোষকতায় মাইজভাগুরী শাহ্ এমদাদীয়া ব্রাদ ডোনর্স গ্রুপের আয়োজনে মাইজভাগুর দরবার শরীফস্থ শাহ্ এমদাদীয়া ভবনে গত ২৫ ডিসেম্বর ১৭ সকাল ৯:৩০ মি. থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মধ্যে ডা: কামরুন নেছা রুনা, ডা: মইনুদ্দীন মঞ্জু, ডা: জি.এম. গোলাম রসুল আতিক, ডা: সৈয়দুল আলম কোরাইশী, ডা: জি.এম. জামাল, ডা: আদনান বিন সালেহ, ডা: আরফাত সুলতানা নিপা, ডা: মুহাম্মদ অহি উদ্দীন, ডা: মুহাম্মদ লোকমান, ডা: মুহাম্মদ এনামুল ইসলাম, ডা: রিগান শীল এবং আল নুর চক্ষু কমিউনিটি হাসপাতালের মেডিক্যাল টিম সহ অন্যান্য ডাক্তারগণ চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। অপসোনিন ফার্মাসিটিউক্যাল লি. এই ক্যাম্পে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। মাইজভাগুর গ্রামের পাটপাড়া সহ ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, রাউজান ও বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত স্থানীয় এলাকাবাসী সহ প্রায় ২০০০ মানুষকে মেডিসিন, হৃদরোগ, শিশু, গাইনী, বাত ব্যাথা, চর্ম ও যৌন, শিশু, অর্থোপেডিক্স এবং চক্ষু বিভাগ সমূহে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মেধা বৃত্তি পরিক্ষা-২০১৭ এর বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

আওলাদে রাসুল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (ম:জি:আ:) এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া)



এর অঙ্গসংগঠন ‘মাইজভাগুরী ফাউন্ডেশন’ এর আয়োজনে প্রতি বছরের মত এই বছরও গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে সকাল ১১টায় গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মেধা বৃত্তি পরিক্ষা-২০১৭ এর বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালিমের প্রতিনিধি মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুরের সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (স:) ও শানে গাউছুল আজম পরিবেশনের পর বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রাণবন্ত উপস্থিতির এবং অতিথিদের আসনগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

ফটিকছড়ি, হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার ৯৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭০০ জনের মত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬০জন এই বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু জাফর চৌধুরী। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক পূর্বকোণের চীফ রিপোর্টার নওশের আলী খান, চট্টগ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ শেখ সাদী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইংরেজী ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ তাহের সেলিম ও ফেনী সরকারী কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস হাসান। এছাড়া আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সচিব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব, যুগ্ম সচিব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর, দারুত তায়ালিমের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক বাবুল, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহিউদ্দীন এনায়েত, আইন বিষয়ক সম্পাদক আবদুল মতিন এবং সহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অধ্যাপক মেজবাউল আলম ভূঁইয়া।



“মিছা দুনিয়ার পিরীত চির দিনত রবেনা।
পরকালের কথা মনে-কর কিছু ভাবনা।।”

মুহাম্মদ সালাউদ্দিন
01815-883538
01875-838029

মা ইলেকট্রনিক্স এন্ড রেফ্রিজারেশান

এখানে এসি, ফ্রিজ, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী
গ্যারান্টি সহকারে মেরামত করা হয়।

কবির আহমদ মার্কেট, আমিরহাট, ১নং হলদিয়া ইউনিয়ন, রাউজান, চট্টগ্রাম।

